বাংলা

বালভারতী

সপ্তম শ্রেণী

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহুত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-২১১৬ / (প্র.ক্র. ৪৩ / ১৬) এসডী-৪ তারিখ ২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ২৯.০৪.২০২২ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২২-২০২৩ এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা

বালভারতী

সপ্তম শ্রেণী

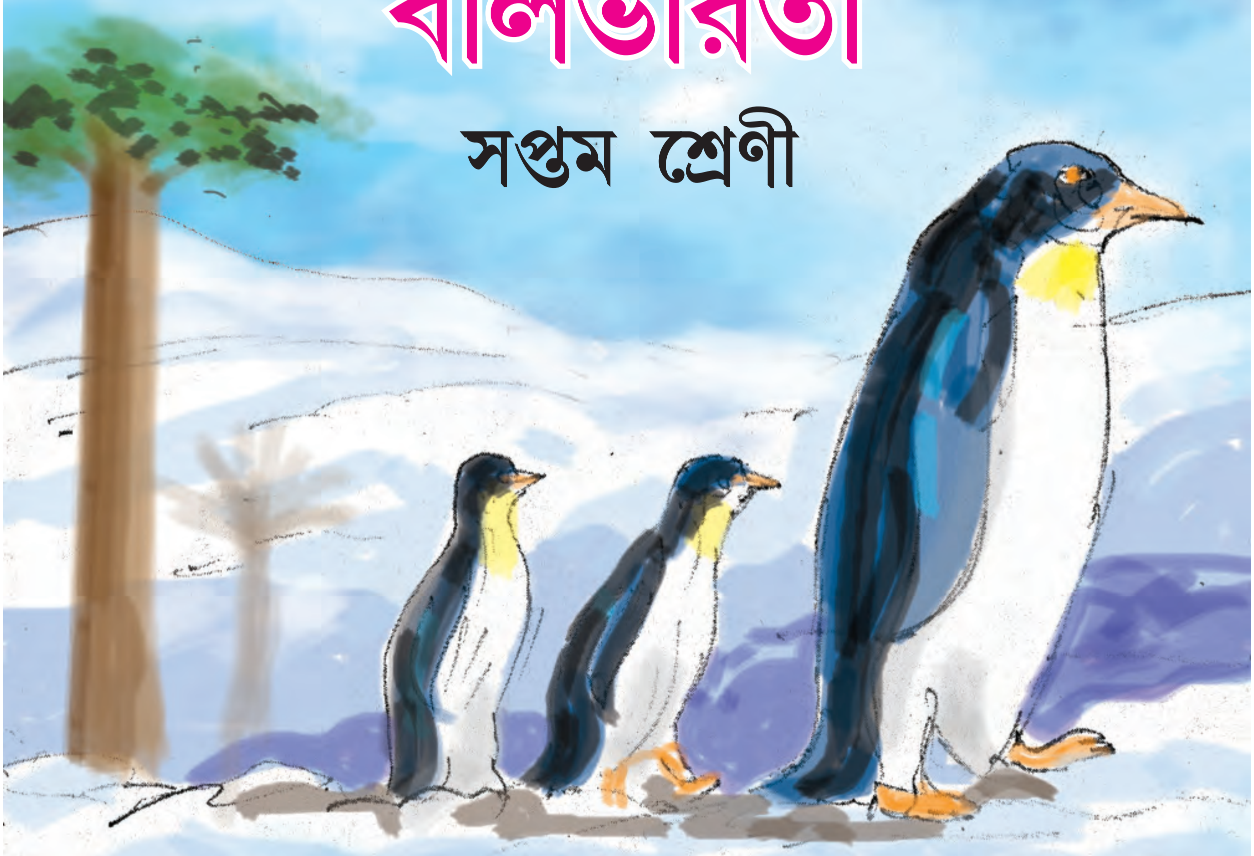

আমার নাম ________________________।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে।

C4B2P3

আপনার স্মার্টফোনে DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার QR Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

FIRST EDITION : 2022

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে ৪১১০০৪

এই বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের কাছে থাকবে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সমিতি

- শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)
- শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথ হালদার (সদস্য)
- শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
- শ্রীমতী বাসন্তী রথীন্দ্রনাথ দাসমণ্ডল (সদস্যা)
- শ্রী শিবপদ রসিকলাল রপ্তান (সদস্য)
- শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই (সদস্যা)
- শ্রী রামপদ কালিপদ সরকার (সদস্য)
- শ্রী মাখন ব্রিটিশ মাঝি (সদস্য)
- শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার (সদস্য)
- ডা. অলকা পোতদার (সদস্য-সচিব)

সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার

বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা

পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

সহায়ক সংযোজক

সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী

সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা

নির্মিতি :

শ্রী সচিন মেহতা

মুখ্য নির্মিতি অধিকারী

শ্রী নিতিন বাণী

সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক :

বিবেক উত্তম গোসাবী

নিয়ন্ত্রক

পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই-২৫

বাংলা ভাষা অভ্যাস গট

- শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
- শ্রী শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল
- শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার
- শ্রী মহীতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল
- শ্রী বাবুরাম অমূল্য সেন
- শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
- শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়
- কু. তৃপ্তিলতা প্রথমেশ বিশ্বাস
- শ্রীমতী পিঙ্কী সুবোধ সাহা
- শ্রী অনিমেশ অরুণ বিশ্বাস
- শ্রী নিথিন বিনয়ভূষণ হালদার
- শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
- শ্রী স্বপন বিশ্বনাথ পাল
- শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
- শ্রী সঞ্জয় দুখীরাম মণ্ডল
- শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
- শ্রী অনিল ধীরেন বারই
- শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
- শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
- শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার
- শ্রী অরুণ দীনবন্ধু মণ্ডল
- শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা

মুখপৃষ্ঠ : আভা ভাগবত

চিত্রাঙ্কন : শ্রী রাজেন্দ্র গিরধারী

অক্ষরাঙ্কন- সমর্থ গ্রাফিক্স্‌

ডিজাইনিঙ্গ : ৫২২, নারায়ণ পেঠ, পুণে ৩০.

কাগজ : ৭০ জী.এস.এম. ক্রিমবোভ

মুদ্রণাদেশ : N/PB/2022-23/1,000

মুদ্রক : M/S. HEXAGON PRINT & PACK PVT. LTD., PALGHAR

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক,ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক,সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন ।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি । আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো । তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত ।

প্রস্তাবনা

স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

ইতিপূর্বেই তোমরা সকলে ষষ্ঠ শ্রেনীর ‘বাংলা বালভারতী’ পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে অবগত হয়েছ। এখন অবশ্যই তোমরা সপ্তম শ্রেনীত ‘বাংলা বালভারতী’ পাঠ্যপুস্তকের জন্য উদ্বিগ্ন। তোমাদের এই উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে ‘মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, বালভারতী’ পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার অনেক বৈচিত্রে সজ্জিত সপ্তম শ্রেনীর ‘বাংলা বালভারতী’ পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রিতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি যেহেতু আমরা মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিবাসী তাই মারাঠি এবং হিন্দি ভাষার কিছু শব্দ এই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আমরা অজানা নই যে তোমাদের কবিতা, গান, গজল, প্রভৃতি শুনতে ভালো লাগে। আমরা এটাও জানি যে সবাই গল্পের জগতে ঘুরতে পছন্দ করে। তোমাদের এই ইচ্ছাগুলো এই পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে সংযোজন করা হয়েছে। বইয়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ, রেখাচিত্র, সাক্ষাৎকার এবং পত্রগুলি তোমাদের জ্ঞান অর্জন এবং বিকাসের জন্য দরকারী। পরীক্ষামূলক শিক্ষার্থীদের জন্য বইয়ের সমস্ত কথোপকথন, হাস্যরসাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক, বিবিধ উদ্যোগ, প্রকল্প ইত্যাদি শোনা, বক্তৃতা, পড়া, লেখা এই সমস্ত ক্ষমতা বিকাসে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হবে।

ডিজিটাল বিশ্বের নতুন উপায়যোজনা, নতুন চিন্তাভাবনা, নিজের বিবেকী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পঠন-পাঠনের দৃঢ়ীকরণের জন্য ‘আমি যা বুঝেছি’, ‘সর্বদা মনে রেখো’ ইত্যাদি কৃতির দ্বারা পাঠ্যপুস্তককে সজ্জিত করা হয়েছে। তোমাদের সৃজনশীলতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে অনেক স্বঅধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভাষা দক্ষতা অর্জণের জন্য ‘ভাষা বিন্দু’ , ‘ব্যক্তিগত প্রশ্ন’, ‘উপযোজিত লেখন’ - ইত্যাদি ব্যাপক ও রঞ্জক রূপে তৈরী করা হয়েছে।

পথপ্রদর্শক এবং সহায়তাকারী ছাড়া লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনীয় ভাষাগত দক্ষতা ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের সহযোগিতা ও নির্দেশনা তোমাদের কাজকে সহজ, সুবিধাজনক এবং সফল করতে সহায়ক হবে। শুধু আশা নয়, আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে এই পাঠ্যপুস্তকটি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে তোমরা বাংলা ভাষা এবং বিষয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং অনুরাগের সাথে উৎসাহ প্রদর্শন করবে।

তোমাদের জন্য রইল অফুরন্ত শুভকামনা।

(বিবেক উত্তম গোসাবী)

সঞ্চালক

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও

অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ০৪

পুণে

তারিখ : ৭ই অক্টোবর ২০২১

ভারতীয় সৌর : ১৫ ই আশ্বিন ১৯৪৩

বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল - সপ্তম শ্রেণী

অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া

সমস্ত শিক্ষার্থীগণের (বিভিন্ন দক্ষ শিক্ষার্থীগণ সহিত) ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত রূপে কাজ করার সুযোগ এবং উৎসাহ প্রদান করা যাতে তারা-

- নিজের ভাষায় কথাবার্তা এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- ভাষা প্রয়োগের সময় সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- দলগত ভাবে কাজ করা এবং একে অপরের কাজের আলোচনা করা মন্তব্য আদান-প্রদান, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার স্বাধীনতা পায়।
- বাংলার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ভাষাগুলির পড়ালেখার সুবিধা (ব্রেল / সাংকেতিক রূপে) এবং তার উপরে স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতে পারে।
- নিজের পরিবেশ, সময়, সমাজের সম্পর্কিত রচনা পড়া এবং তার উপর আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- স্বীয় ভাষা গঠনের সময় লেখন সম্বন্ধীয় গতিবিধি যেমন-শাব্দিক খেলা, ব্যক্তিগত পত্র, মিত্রাক্ষরী, হেঁয়ালি স্মৃতি মন্থনের সুযোগ পায়।
- সক্রিয় এবং জাগরুক তৈরী করার বিভিন্ন রচনা, খররের কাগজ বিভিন্ন পত্রিকা, চলচ্চিত্র এবং অডিও-ভিডিত্ত সামগ্রীগুলি দেখা, শোনা, পড়া লেখা এবং চর্চা করার সুযোগ পায়।
- কল্পনা প্রবণ এবং সৃজনশীলতা বিকশিত করার গতিবিধি অভিনয়, কবিতা, পাঠ, সৃজনাত্মক লেখন, বিভিন্ন স্থিতিতে কথোপকথন প্রভৃতির আয়োজন হওয়া এবং তার প্রস্তুতি সম্বন্ধে স্ক্রিপ্ট লেখন এবং বর্ণনা লেখনের সুযোগ পায়।
- বিদ্যালয় / বিভাগ / শ্রেণীকক্ষ পত্রিকা / দেওয়াল পত্রিকা তৈরী করার জন্য প্রোৎসাহন পায়।

অধ্যয়ন ফলাফল

শিক্ষার্থীরা

07-11-01 বিভিন্ন ধরনের রচনা (গীত, কাহিনী, একাঙ্কী, নিবেদন, নির্দেশ) ইত্যাদি আকলনের সঙ্গে শোনে পড়ে সমষ্টিগত রূপে আলোচনা করে এবং শোনায়।

07-11-02 শোনা বাক্য, তার সম্বন্ধে অন্য বাক্য, রচনার সম্পর্কে বলা মন্তব্য, বাক্যাংশগুলির অনুমান করে বুঝে নিয়ে নিজের অনুভবের সাথে সংগতি, সহমত কিংবা অসহমতের অনুমান করে নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করে ও নিজের শব্দে সরল অর্থ এবং সারাংশ লেখন করে।

07-11-03 কোনো চিত্র বা দৃশ্য দেখা, অনুভবের মৌখিক বা লিখিত সূচনার আলেখরূপে পরিবর্তন করে অভিমত ব্যক্ত করে এবং সারাংশ লেখন করে।

07-11-04 দেওয়া বিষয় এবং পঠিত সামগ্রীর সম্বন্ধে প্রশ্ন নির্মিতি করার সময় দিশা নির্দেশ করে কোনো প্রসঙ্গ নিজের শব্দে পুনঃপ্রস্তুত করে এবং সঠিক উত্তর লেখন করে।

07-11-05 বিভিন্ন স্থানীয় সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নথি বা ঘটনার প্রতি সমীক্ষাপূর্ণ বিচার করে, বিষয়ের উপরে আলোচনা করে তথা তার্কিক প্রতিক্রিয়া লিখিত রূপে ব্যক্ত করে।

07-11-06 কোনো একটি পাঠ্যপুস্তক পড়ে তার উপযোগিতা বলে তথা অভিব্যক্তি ক্ষমতা দ্বারা শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে শব্দের অর্থ লিখিত অভিব্যক্তির পূর্বানুমান অনুসারে পঠন করে।

07-11-07 লিখিত তথ্যে অস্পষ্টতা সংমিশ্রণে ন্যূনতা, অসঙ্গতি, অসমানতা এবং অন্য দোষগুলি চিনে পঠন করে। তার মধ্যে কোনো একটি বিন্দু খুঁজে স্বীয় সংবেদনা, অনুভূতি, ভাবনা ইত্যাদি সঠিক রূপে প্রেরণ করে।

07-11-08 যুগ্ম বা দলগত কৃতি বা উপক্রমরূপে সংলাপ, প্রহসন, জোকস্, নাটক ইত্যাদি পড়ে ও তাতে সহভাগী হয়ে কার্যকর প্রস্তুতি করে।

07-11-09 রূপরেখা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সংলাপ, পত্র, প্রবন্ধ, বৃত্তান্ত, ঘটনা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির পঠন এবং লেখন করে।

07-11-10 দৈনিক কার্য পরিকল্পনা এবং ব্যবহৃত বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, নুতন শব্দ শোনে ও মৌখিক রূপে প্রয়োগ করে এবং লিখিত রূপে সংগ্রহ করে।

07-11-11 পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় বুঝে নিয়ে নিজের জন্য আবশ্যক তথ্যচিত্র, ভিডিওক্লিপ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ইন্টারনেটে খুঁজে পড়ে ও যোগ্য প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভাষণ তৈরী করে লিখিত বক্তৃতা দেয়।

07-11-12 দেওয়া প্রসঙ্গের শাব্দিক ও অন্তর্নিহিত অর্থ শ্রবণ করে শুদ্ধ উচ্চারণ, উচিৎ বলাঘাত লয়-তাল এবং গতি সহিত মুখর এবং মৌন পঠন করে।

07-11-13 বিভিন্ন অবসর, ঘটনা প্রসঙ্গ ভাষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা এর সহ-সম্বন্ধ চিনে শুনে নেয় এবং তার সম্বন্ধে বাক্য নির্মিতি করে অভিব্যক্ত করে।

07-11-14 প্রসার মাধ্যম থেকে এবং অন্য কার্যক্রম শুনে তার মহত্ত্বপূর্ণ অংশ, বিবরণ, প্রধান নথি ইত্যাদি পুনরায় মনে করে বলে ও নিজ সম্ভাষণে এবং লেখনে তা ব্যবহার করে।

07-11-15 কোনো উপস্থাপনা সম্বন্ধে স্বীয় পরীক্ষণ / অনুভব / পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সূচনার প্রতিপাদন করে তথা সংকেত স্থলের গঠন বুঝে নিয়ে তার মধ্যে নিহিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের লিখিত ব্যবহার করে।

07-11-16 ব্যক্তিগত অনুভবের মধ্যে নিহিত ভাবধারা, অনানুষ্ঠানিক সম্ভাষণ ঘোষণা, সাক্ষাৎকার লক্ষ্যপূর্বক শোনে ও শোনায় এবং তার মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করে পঠন করে।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য দুটি কথা

শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন-অনুভব দেওয়ার পূর্বে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া সূচনাগুলি, অধ্যয়ন সংকেত এবং দিশা নির্দেশগুলি ভালো করে আত্মসাৎ করে নিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া সকল কৃতিগুলি শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলন করানো আবশ্যক। অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সময় আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তরকে অধিক মহত্ব প্রদান করা অপেক্ষিত থাকবে। ডিজিটাল এবং ইলেক্ট্রনিক প্রসঙ্গে (ইন্টারনেট, অ্যাপ্স, সংকেত স্থান ইত্যাদি) আপনাদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। ভাষা অধ্যয়নের অনুশীলনের জন্য অধিকাধিক প্রসঙ্গ এবং বিভিন্ন উদাহরণের প্রয়োগ অপেক্ষিত থাকবে। ব্যাকরণের অধ্যাপন পরম্পরাগত ভাবে করা হবে না। বিভিন্ন উদাহরণ, প্রয়োগ, কৃতি দ্বারা বিষয়বস্তুর সংকল্পনাকে স্পষ্ট এবং দৃঢ়ীকরণ করা আবশ্যক। পরিপূরক পঠন সামগ্রী শুধু পাঠকে পোষিত করে না, তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পঠন সংস্কৃতিকে বৃদ্ধি করে অধ্যয়নের প্রতি রুচি নির্মাণ করে। অতএব পরিপূরক পঠন অনিবার্য এবং আবশ্যকভাবে করাবেন। অধ্যাপনের সময় ইন্টারঅ্যাক্টিব সামগ্রীর ব্যবহার করবেন।

পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া সামগ্রীকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জুড়ে ভাষা ও অনুশীলনের সাথে সম্বন্ধ স্থাপিত করা হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে পাঠ্য ব্যতিরিক্ত ভাষিক গতিবিধি, কৃতি, খেলা, সন্দর্ভ, প্রসঙ্গ, ইত্যাদির সমাবেশ অপেক্ষিত।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনমূল্য, জীবনকৌশল্য, মৌলিক তত্ত্বের বিকাসের সুযোগ প্রদান করবেন। ক্ষমতাবিধান এবং পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্নিহিত সকল ক্ষমতা / কৌশল, অনুশীলনের সতত সার্বিক মূল্যয়নও অপেক্ষিত থাকবে।

আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, উক্ত সূচনার পালন করে শিক্ষক, অভিভাবক, সকলে এই পুস্তকটিকে সহর্ষে স্বাগত করবেন।

সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পদ্য / গদ্য	লেখক / কবির নাম	পৃ.ক্র.
১.	মা	পদ্য	রজনীকান্ত সেন	১
২.	লোভসংবরণ	গদ্য	সংকলিত	৪
৩.	হিম জগতের অধিবাসী	গদ্য	সুদীপ্তা সেনগুপ্ত	৮
৪.	ছায়াবাজী	পদ্য	সুকুমার রায়	১৪
৫.	বিচার	গদ্য	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
৬.	শাসকের দুরাচার	গদ্য	সুভাষ চন্দ্র বসু	২৩
৭.	বাঙ্গালীর সংগীত	পদ্য	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস	২৯
৮.	মাস্টার মশাই	গদ্য	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৩২
৯.	সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার	গদ্য	অরূপ মুখোপাধ্যায়	৩৮
১০.	রাঙা চুড়ি	পদ্য	কালিদাস রায়	৪৩
১১.	রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী	গদ্য	সংকলিত	৪৭
১২.	কালকেতুর ভোজন	পদ্য	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	৪৯

দ্বিতীয় বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পদ্য / গদ্য	লেখক / কবির নাম	পৃ.ক্র.
১৩.	ছন্দে শুধু কান রাখো	পদ্য	অজিত দত্ত	৫২
১৪.	বটগাছ ও মানুষের পত্র	গদ্য	ড.জিতেন্দ্র পাণ্ডেয়	৫৬
১৫.	পঞ্চ পরমেশ্বর	গদ্য	মুন্সী প্রেমচন্দ	৫৯
১৬.	সিদ্ধার্থের দয়া	পদ্য	নবীনচন্দ্র সেন	৬৫
১৭.	চিন্তাশীল	গদ্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯
১৮.	খোলা মাঠের মানুষটি	গদ্য	শঙ্করী প্রসাদ বসু	৭৬
১৯.	অচল হলে চলবে না	পদ্য	অতুল প্রসাদ সেন	৮২
২০.	জল আছে তো ভবিষ্যৎ আছে	গদ্য	সঞ্জয় ভারদ্বাজ	৮৫
২১.	একুশের তাৎপর্য	গদ্য	আবুল ফজল	৯১
২২.	আত্মজীবনী	গদ্য	এ.পি.জে আব্দুল কালাম	৯৫
২৩.	ছাত্র আর শিক্ষকের সংলাপ	গদ্য	সংকলিত	১০০
২৪.	হাইকু	পদ্য	কমলেশ ভট্ট কমল	১০৩

১. মা

- রজনীকান্ত সেন

কবি পরিচিতি

রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫ সালের ২৬ শে জুলাই বাংলার সিরাজগঞ্জ জেলার সেন ভাঙাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ও মাতা ছিলেন মনমোহিনী দেবী। ১৮৮৩ সালে কুচবিহার জেনেকিন্স স্কুল থেকে ২য় বিভাগে এন্ট্রাস পাশ করেন এবং ১৮৯১ সালে আইন বিষয়ে বি.এল.ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙ্গালী কবি, গীতিকার সুরকার ও গায়ক। স্বাধীনতার সুখ, পরোপকার ইত্যাদি রজনীকান্ত সেনের বিখ্যাত কবিতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী - কান্তগীত, বাণী, কল্যাণী ও অমৃতা ইত্যাদি। ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে ৪৫ বছর বয়সে এই মহান কবি পরলোক গমন করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবি এই ‘মা’ কবিতাটির মাধ্যমে শিশুর জীবনে তার মায়ের অসীম অবদান ও মহান আত্মত্যাগের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। শিশুর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য মা তার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে শিশুর লালন পালন করেন। মা সমস্ত রাত্রি জেগে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শিশুকে অমৃত ধারা দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে সস্নেহে বুকে তুলে নেন। এই স্নেহময়ী মায়ের প্রতি যেন শিশুর শ্রদ্ধাভক্তি অব্যাহত থাকে।

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে !
        মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
        এনেছে অশরণ লাগি রে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে;
        আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
        তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে

টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ ভুলি,
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !

করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশিস্ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি,
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহরাশি,
বক্ষে ধরি চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর;
নমো নমো নমঃ, জননী দেবি মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে।

শব্দার্থ

স্নেহ-বিহ্বল = দয়ায় বিভোর	**আশিস** = আশীর্বাদ	**করুণা** = দয়া, অনুগ্রহ
পীযূষ = অমৃত, সুধা	**সঞ্জীবনী** = জীবনদায়িনী	**নির্ঝর** = ঝর্ণা
অশরণ = অনাথ, নিরাশ্রয়	**মতি** = বুদ্ধি, ইচ্ছা	**যামিনী** = রাত্রি

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

শিশুর জন্য মা যা যা করছে।

২) **জোড়া মেলাও।**

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) করুণা	১) সুধা
খ) সঞ্জীবনী	২) ধূলি
গ) গভীর	৩) ছলছল
ঘ) চরণ	৪) যন্ত্রনা

৩) **কবিতা থেকে শব্দার্থ খুঁজে লেখো।**

ক) মাতা -...................... খ) পা -......................

গ) নয়ন -...................... ঘ) শরীর -......................

৪) **কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) দুঃখে ×...................... খ) বিষ ×......................

গ) পাপ ×...................... ঘ) শয়নে ×......................

৫) **কবিতা থেকে নীচে দেওয়া শব্দের অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) জাগরণে -...................... খ) তুলি -......................

গ) সুখে -...................... ঘ) সান্ত্বনা -......................

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) আঁখি কোথায় জাগে ? খ) তনু মলিন কেন ?

গ) কে বদন-পানে চেয়ে থাকে ? ঘ) শিশু জননীর কাছে কি চাইছে ?

৭) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"মায়ের ভালোবাসার তুলনা নেই।"- এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৮) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুযায়ী কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম -....................................

খ) কবির নাম -....................................

গ) তোমার পছন্দের যে কোন দু'টি পংক্তি -................................

ঘ) পংক্তি দু'টি পছন্দ হওয়ার কারণ -....................................

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা -....................................

● **সর্বদা মনে রেখো।** ●

"জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ।"

● **উপযোজিত লেখন :**

বৃত্তান্ত লেখন - তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'প্রারম্ভিক দিবস'- এ বিষয়ে একটি বৃত্তান্ত লেখো।

২. লোভসংবরণ

\- সংকলিত

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে গরীব বালক একটি বাটীতে গৃহমার্জনের কাজে নিযুক্ত ছিল। গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কার করতে-করতে অসাধারণ সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল সোনার ঘড়ি হাতে নেয়। ঘড়িটি অতি মনোহর উত্তম স্বর্ণে নির্মিত, তাই চুরি করার ইচ্ছা হয়। পরবর্তী মুহূর্তে সে তার জননীর উপদেশ ও চুরির গ্লানি ও ক্লেশের কথা মনে করে যথাস্থানে রেখে দেয়। গৃহস্বামীনী আড়াল হতে সমস্ত বিষয় দেখে বালকটিকে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু শোনামাত্র ভয়ে কাঁপতে ও অশ্রুজলে ভেসে যেতে দেখে সমস্ত ব্যাপার বুঝে বালকটিকে অভয়দান দেয় ও সন্তুষ্ট হয়ে তার শিক্ষার সমস্ত খরচা বহন করেন।

এক দীন বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জন প্রভৃতি অতি সামান্য নিকৃষ্ট কর্মের ভার ছিল। সে একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে, তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না এজন্য সে নির্ভয়ে, এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্মিত, এবং ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত! সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল যদি আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া জানিতে পারিতেছে না কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দশার সীমা থাকিবে না। সর্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর, যদিই আমি চুরি করিয়া মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট

অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং আমরা যখন যাহা করি সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে তাহার মুখ ম্লান ও সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ, লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই চোর হয়। আমি আর কখন কোনও বস্তুতে লোভ করিব না এবং লোভের বশীভূত হইয়া চোর হইব না। চোর হইয়া ধনবান হওয়া অপেক্ষা ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া আমার মনে এত ক্লেশ হইল, চুরি করিলে না জানি আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী ঐ সময়ে পার্শ্ববর্তী থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কি জন্য আমার ঘড়িটি লইলে না ? বালক শুনিবামাত্র হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না কেবল জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষন্ন বদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী স্বস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি কি জন্য এত কাতর হইতেছ ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি, কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই।

জগদীশ্বর তোমায় যে লোভ সংবরণ করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপ লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ তজ্জন্য তোমায় পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমার আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচকর্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভ্যাস করিলে আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব এবং অন্ন, বস্ত্র পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জনা করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ্য স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শণে, ঐ দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, যার পর নাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিল এবং লোকসমাজে বিদ্বান ও ধর্ম পরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

শব্দার্থ

দীন = গরীব
বাটী = বাড়ি
নিকৃষ্ট = নীচ, অপকৃষ্ট
দৃষ্টিগোচর = দেখা যায় এমন
ক্লেশ = কষ্ট, দুঃখ
মার্জন = মোছা
আহ্লাদ = আনন্দ, প্রসন্ন
পুলকিত = আনন্দিত
ঔজ্জ্বল্য = দীপ্তি
পরিত্রান = রেহাই, মুক্তি
সুবোধ = সুশীল, উত্তম বুদ্ধি

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) গৃহস্বামীর একটি .... ঘড়ি ছিল।
খ) ঈশ্বরের নিকট কখনও .... পাইতে পারিব না।
গ) জগদীশ্বর তোমায় যে .... করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন।
ঘ) তুমি বিদ্যাভ্যাস করিলে আরও .... ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে।

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) দীন বালকটি গৃহমার্জন করিত না। -..............

খ) বস্তুগুলি নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে। -..............

গ) গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। -..............

ঘ) বিদ্যাভ্যাস করিলে সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে না। -..............

৩) কারণ লেখো।

ক) চুরি করিতে নাই। খ) বিদ্যাভ্যাস করা উচিৎ।

৪) সমানার্থী শব্দ লেখো।

ক) বাটিকা = ... খ) নিকৃষ্ট = ...

গ) পুলকিত = ... ঘ) ম্লান = ...

৫) বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) ধনবান ×...................... খ) ভয় ×......................

গ) সুবোধ ×...................... ঘ) সচ্চরিত্র ×......................

৬) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) দীন বালকটি কোথায় নিযুক্ত ছিল?

খ) গৃহস্বামীর ঘড়িটি কেমন ছিল?

গ) কে পার্শ্ববর্তী থেকে বালকের সমস্ত কথা শুনছিল?

ঘ) জগদীশ্বর কাকে লোভসংবরণ করার শক্তি দিয়েছেন?

ঙ) গৃহস্বামীনী বালকটিকে লোভসংবরণের জন্য কী পুরস্কার দিয়েছিলেন ?

৭) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

ক) বালকটি নির্ভয়ে গৃহস্বামীর বাসগৃহে কী-কী করছিল ?

খ) চুরির কথা মনে করে বালকটি কী-কী ভাবছিল?

● সর্বদা মনে রেখো। ●

'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'

● আমি বুঝেছি :..

....

● ভাষাবিন্দু : লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

ক) সিংহী - .... খ) বালক - ....

গ) গৃহস্বামিনী- .... ঘ) চাকর - ....

● উপযোজিত লেখন :

সৎপথে চলা উচিৎ - এ বিষয়ে ১০ লাইন লেখো।

৩. হিম জগতের অধিবাসী

- সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

লেখক পরিচিতি

লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্তর জন্ম ২৮শে আগষ্ট ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে কোলকাতা শহরে। তাঁর পিতা জ্যোতিরঞ্জন সেনগুপ্ত মাতা পুষ্পা সেনগুপ্ত। ইনি একজন ভূতত্ত্বের অধ্যাপিকা। বি. এসসি ও এম. এসসি-তে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন। পর্বতারোহণ বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শিণী। ১৯৮৩ সালে ভারতের তৃতীয় আন্টার্কটিকা অভিযানে প্রথম বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানী রূপে অংশগ্রহণ করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

'হিম জগতের অধিবাসী' রচনাটি লেখিকার আন্টার্কটিকা গ্রন্থ থেকে সংকলিত। আন্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে থাকা দক্ষিণ সমুদ্র প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। দু'তিন কিলোমিটার পুরু বরফে ঢাকা গোটা মহাদেশ।

এই মহাদেশে পেঙ্গুইন সিলমাছ বা পাখিরা বেশী সময় কাটায় সমুদ্রের জলে বা বরফে; আর আছে ক্ষুদ্র কীট এরা মস বা শ্যাওলা জাতীয়। আন্টার্কাটিকায় সমুদ্রে প্রাণীসম্পদ অঢেল।

আন্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে যে দক্ষিণ সমুদ্র রয়েছে তা পৃথিবীর উর্বর জমি থেকেও প্রাণ-প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। কেউ কেউ এই সমুদ্রকে তুলনা করেছেন বুইয়াবেস্ বা ফরাসি মাছের সুপের সঙ্গে। আবার অন্যদিকে আন্টার্কটিকা মহাদেশে প্রাণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অবশ্য যে মহাদেশের আটানব্বই শতাংশ দু-তিন কিলোমিটার পুরু বরফে ঢাকা, সেখানে উদ্ভিদ জন্মানোর অনুকূল অবস্থা যে মোটেই নেই তা বলাই বাহুল্য। আবার যেহেতু প্রাণীকুল ক্ষুন্নবৃত্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপরেই নির্ভরশীল, তাদের সংখ্যাও স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। আন্টার্কটিকাতে যে কয়েকটি প্রাথমিক নিম্নশ্রেণির প্রাণী বা উদ্ভিদ দেখা যায় তার বেশিরভাগই পাওয়া যায় কুমেরু বৃত্তের বাইরে আন্টার্কটিকা উপদ্বীপে আর তার সংলগ্ন দ্বীপগুলিতে, কারণ সেখানকার গড় তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি। বাকি জায়গায় মস, অ্যালগি এবং লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণের চিহ্ন নেই বললেই চলে।

আন্টার্কটিকা উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে এবং কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে তিন ধরনের

পুষ্পবাহী লতা আর এক ধরনের ঘাস দেখতে পাওয়া যায়, লতাগুলির নাম Deschampia, Deschampia elegantula এবং Colobanthus crassifolius এবং ঘাসটির নাম হচ্ছে Poa annua। সমগ্র আন্টার্কটিকার বাকি অংশে, কুমেরু বৃত্তের অন্তর্গত অঞ্চলে উদ্ভিদ বলতে আছে প্রধানত মস, লাইকেন এবং অ্যালগি। এই সব শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদগুলির মধ্যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তীব্র শীত সহ্য করবার। প্রতিকূল অবস্থায়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এরা সুপ্ত অবস্থায় থাকে আর পরিবেশ অনুকূল হলেই জীবনে ফিরে আসে। তবে এদের অবস্থানও সাধারণত আন্টার্কটিকার তীর ঘেঁষে বা ট্রান্স-আন্টার্কটিক পর্বতমালাতে যেখানে পাথুরে জমি বেরিয়ে আছে। বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দরকার তা হাওয়ায় উড়ে আসা পাখিদের মলমূত্র থেকেই এরা পেয়ে যায়।

মস পাওয়া যায় পার্বত্য এলাকায় প্রধানত হিমবাহজাত হ্রদের আশেপাশে। আমরা যেখানে কাজ করেছি-শির্মাকার পাহাড়ে-সেখানে মস দেখেছি ঘন সবুজ বা খয়েরি রঙের। বেশিরভাগই ছিল এক সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে কম পুরু। তবে আন্টার্কটিকার উপদ্বীপ অঞ্চলে কোথাও কোথাও মস এত ঘন যে এক ফুট পর্যন্ত গভীর হতে পারে। আন্টার্কটিকাতে লাইকেন (lichen) আছে প্রায় বারশো ধরনের। হলুদ, লাল সাদা, কালো হরেক রঙের লাইকেন দেখতে পাওয়া যায় ওখানে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে পাথরের গায়ে কেউ রঙ করে দিয়েছে। শির্মাকার পাহাড়ে আমরা ওই চার রঙের লাইকেনই বেশি দেখেছি। তার মধ্যে লাল লাইকেন সবচেয়ে কম দেখা যায়, কেবলমাত্র উঁচু জায়গায়, পাহাড়ের শৃঙ্গ বা তার কাছাকাছি জায়গাতেই এই লাল লাইকেন দেখেছি। পেঙ্গুইনের রুকারিগুলোতে সাধারণত হলুদ লাইকেন বেশি দেখা যায়। পাথুরে জায়গার ধারে যেখানে বরফ শুরু হয়েছে, সেখানে ঠিক পাথরের গায়ের কিছুটা বরফ গলে একটু গর্ত মতন হয়েছে। সেখানেই লাইকেন বেশি জন্মায়। আন্টার্কটিকার লাইকেনের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার লাইকেনের খুব মিল আছে এবং লাইকেনের সূত্র ধরে দক্ষিণ গোলার্ধের উদ্ভিদের সঙ্গে

আন্টার্কটিকার উদ্ভিদের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

মস এবং লাইকেনের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায় অ্যালগি (algae)। পাথর বরফ সমুদ্র-সর্বত্রই এরা আছে। সামুদ্রিক বরফ ভেঙে উল্টে গেলে প্রায়ই দেখা যায় নীলচে সবুজ বা হলুদ রঙের শ্যাওলার আভাস। নানান ধরনের সবুজ ছাড়াও হলুদ, কমলা, খয়েরি বা ছাই রঙেরও অ্যালগি দেখতে পাওয়া যায়। কার্বন-১৪ ডেটিং করে কোন কোন অ্যালগির বয়স দেখা গেছে ছয় হাজার বছরেরও বেশি।

আন্টার্কটিকাতে নরম মাটি যদিও কম তবু যেটুকু আছে তার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মাটির বিশেষ তফাৎ নেই। এখানেও অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে যার থেকে বোঝা যায় যে, পরিবেশ অনুকূল হলে এই মাটিতে উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব। এখানকার হিমবাহজাত মিষ্টি জলের হ্রদগুলিতে নানান ধরনের ব্যাকটিরিয়া এবং কয়েক ধরনের ফাঙ্গাস পাওয়া যায়।

এই তো গেল উদ্ভিদের অবস্থা। প্রাণীর ক্ষেত্রে আন্টার্কটিকা মহাদেশের অবস্থা খুবই করুণ। কয়েক ধরনের নিম্নশ্রেণির কীটপতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই বিশেষ নেই। পেঙ্গুইন, সিল বা পাখিরা যেহেতু সামুদ্রিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল তাই তারা জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটায় সমুদ্রের জলে বা সামুদ্রিক বরফের উপরে। তাই এদের ডাঙার চেয়ে সামুদ্রিক প্রাণী বলাই সঙ্গত। আন্টার্কটিকা মহাদেশের কীটপতঙ্গগুলোর মধ্যে অর্ধেকই হচ্ছে আবার উকুন জাতীয় পরজীবী যারা পেঙ্গুইন বা সিলের গায়ে থাকে। তাদের বাদ দিলে বাকি থাকে শুধু পাখাবিহীন এক ধরনের মাছি আর স্প্রিংটেল বা মাইট জাতীয় ক্ষুদ্র কীট। এদের বেশিরভাগের খাদ্য হচ্ছে লাইকেন। কিছু কিছু আবার একে অন্যকে খেয়ে বাঁচে, এদের সকলের মধ্যেই বিশেষ ক্ষমতা আছে যার বলে প্রতিকূল অবস্থায় বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় এরা নিজেদের প্রাণযন্ত্র-এর সুইচ অফ্ করে দেয় আবার ঠাণ্ডা কমে গেলে দিব্যি সজীব হয়ে ওঠে। এইসব পোকাদেরও বেশিরভাগই দেখা যায় আন্টার্কটিকা উপদ্বীপে কুমেরু বৃত্তের বাইরে। আন্টার্কটিকার বরফের রাজ্যে একটি ক্ষুদ্রস্যক্ষুদ্র কীট দেখা গেলে তা হয়ে ওঠে গবেবণার বিষয়। আমরা যখন শির্মাকার পাহাড়ে কাজ করেছি বহু খুঁজেও কখনো একটি পোকামাকড় পাইনি। শোনা গেছে একবার আমেরিকার নেভির কিছু লোক রসিকতা করে একটি বোতলে করে মাছি এনে ছেড়ে দিয়েছিল আন্টার্কটিকাতে। বৈজ্ঞানিকরা সংলগ্ন এলাকা থেকে সেই মাছি সংগ্রহ করে প্রচণ্ড উল্লসিত হয়েছিলেন। পরে সত্যি ঘটনা জানতে পেরে তারা খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। এ ধরনের রসিকতা যত কম হয় ততই মঙ্গল। আন্টার্কটিকার প্রাণীদের বিষয়ে এখনও অনেক গবেষণা বাকি

আছে। যতটা সম্ভব চেষ্টা করা উচিত যাতে পরিবেশের আদি বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

আন্টার্কটিকা মহাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হচ্ছে আন্টার্কটিক সমুদ্রের। সেখানে প্রাণের প্রাচুর্য এত বেশি যে পৃথিবীর আর কোথাও এর তুলনা নেই। সমপরিমাণ এলাকা থেকে আন্টার্কটিকার সমুদ্র যত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, শর্করা ইত্যাদির জোগান দিতে পারবে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে বিশ্বের সেরা উর্বর জমিও পেরে উঠবে না। আশ্চর্যের কথা যে এর কারণও আন্টার্কটিকার সমুদ্রের প্রচণ্ড শৈত্য। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার ফলে আন্টার্কটিকার সমুদ্র অনেক বেশি অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ধারণ করে রাখতে পারে। শীতকালে দক্ষিণ সমুদ্রের জল পঁচানব্বই শতাংশ অক্সিজেন সম্পৃক্ত থাকে। গ্রীষ্মকালে এই পরিমাণ কিছুটা কমলেও যা থাকে তা পর্যাপ্তের বেশি। এছাড়া, এখানকার জলে নাইট্রেট ও ফসফেটের পরিমাণও প্রচুর। ছ'মাস সূর্যালোকও জলের উদ্ভিদের ফোটোসিনথেসিসের কাজে বেশ সাহায্য করে। এছাড়া শীতে সমুদ্র জমে যাওয়াতে আবার গ্রীষ্মে সেই বরফ গলে যাওয়ায় জলের লবণত্বের হেরফের হয় এবং তার ফলে জলের মধ্যে উর্ধ্বগামী স্রোতের সৃষ্টি হয়। তলার থেকে উঠে আসা স্রোতের সঙ্গে উদ্ভিদের খাদ্য নানা মণিককণাও (minerals) উঠে আসে।

জলের এই উর্বরতার ফলে সমুদ্রে উদ্ভিদ-প্ল্যাংকটনের (phytoplankton) অসম্ভব প্রাচুর্য দেখা যায়। এগুলি হল সমুদ্রে ভাসমান ছোট ছোট এক জাতীয় উদ্ভিদ যা সমুদ্রের উপরিভাগে ভেসে বেড়ায়। উদ্ভিদপ্ল্যাংকটন আবার প্রাণী-প্ল্যাংকটনের (zooplankton) খাদ্য। ফলে আন্টার্কটিকার জলে লাখে লাখে ভাসমান প্রাণী-প্ল্যাংকটন জন্মায়। এদের মধ্যে পড়ে নানান জাতের ছোট ছোট প্রাণী। আন্টার্কটিকার বিখ্যাত চিংড়ি মাছ ক্রিল এই শ্রেণিরই অন্তর্গত। দক্ষিণ সমুদ্রের জলে এত প্রচুর পরিমাণে এরা থাকে যে এদের উপস্থিতির ফলে সমুদ্রের জল কোথাও কোথাও লালচে দেখায়। আবার এই ক্রিল বা সমজাতীয় প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে বড় মাছ, পেঙ্গুইন, সিল এবং তিমির দল। তাদের সংখ্যাও অপর্যাপ্ত। বিজ্ঞানীরা তাই এই দক্ষিণ সমুদ্রকে তুলনা করেছেন মাছের ব্রথ বা উপাদেয় ফরাসি মাছের সুপের সঙ্গে।

আন্টার্কটিকার সমুদ্রের শীতল তাপমাত্রা অন্যভাবেও এই প্রাণীকুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শৈত্য প্রাণীদের আয়ু বাড়ায়। অতিরিক্ত শৈত্যের ফলে একই সঙ্গে অনেক প্রজন্ম বেঁচে থাকে। তাই আন্টার্কটিকাতে প্রজাতির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হলেও একই প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর।

শব্দার্থ

প্রাণ প্রাচুর্য = প্রচুর জীবন
মস = শ্যাওলা
কুমেরু = দক্ষিণ মেরু
হিমবাহ = চলমান তুষার স্তূপ
সঙ্গত = উচিৎ
সম্পৃক্ত = সংযুক্ত
ক্ষুন্নিবৃত্তি = ক্ষিধে মেটনো
উপদ্বীপ = প্রায় দ্বীপের মতো
অনুবীক্ষণিক = যা অনুবীক্ষণ দিয়েই দেখা যায়
পরজীবী = পরকে আশ্রয় করে যারা বাঁচে।

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

অ্যালগির রঙ

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) দক্ষিণ সমুদ্রকে মাছের সুপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। -..............

খ) শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদগুলির মধ্যে শীত সহ্য করার ক্ষমতা নেই। -..............

গ) মস পাওয়া যায় পার্বত্য এলাকায়। -..............

ঘ) আন্টার্কটিকাতে নরম মাটি বেশি। -..............

ঙ) উদ্ভিদ-প্ল্যাংকটন প্রাণী - প্ল্যাংকটনের খাদ্য। -..............

৩) কারণ লেখো।

ক) আন্টার্কটিকা মহাদেশে প্রাণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

খ) সমুদ্রের জল কোথাও কোথাও লালচে দেখায়।

গ) জলের মধ্যে উর্দ্ধগামী স্রোতের সৃষ্টি হয়।

ঘ) সমুদ্রের শীতল তাপমাত্রা অন্যভাবেও এই প্রাণীকুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৪) শব্দগুলির বিপরীত অর্থ পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।

ক) উত্তর ×....................... খ) পাতলা ×.......................

গ) অপ্রাচুর্য ×....................... ঘ) কম ×.......................

ঙ) শেষ ×.......................

৫) **শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।**

ক) শ্যাওলা - .... খ) সংযুক্ত - ....

গ) দক্ষিণ মেরু - .... ঘ) ক্ষিধে মেটানো - ....

ঙ) প্রায় দ্বীপের মতো - ....

৬) **পদ পরিবর্তন করো।**

ক) লতা -...................... খ) রঙ -......................

গ) মাটি -...................... ঘ) পার্বত্য -......................

ঙ) পাহাড় -...................... চ) প্রাচুর্য -......................

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) মস বলতে কি বোঝ ? খ) কোথায় প্রাণের অস্তিত্ব প্রায় নেই?

গ) পশ্চিম তীরের দ্বীপগুলিতে কত ধরনের লতা দেখা যায়?

ঘ) অ্যালগি সাধারণত কোথায় দেখা যায় ?

৮) **সংক্ষেপ উত্তর দাও।**

ক) আন্টার্কটিকার শ্যাওলার বৈশিষ্ট্য কী?

খ) ক্ষুদ্র কীট মাইটদের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দাও।

গ) আন্টার্কটিকা সমুদ্রে প্রাণের প্রাচুর্য আছে কেন?

● **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

আন্টার্কটিকা মহাদেশে জীবনযাত্রা খুবই কষ্টকর এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

● **সর্বদা মনে রেখো।** ●

ক্ষুদ্র সজীবও পরিবেশের একটি অঙ্গ।

● **আমি বুঝেছি :**...

....

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

ক) শিক্ষক -...................... খ) সাহেব -......................

গ) পুরুষ -...................... ঘ) স্বামী -......................

ঙ) বাবা -......................

● **উপযোজিত লেখন :**

অন্য লেখকের ভ্রমন কাহিনী পড়ে তুমি তোমার মতো করে একটি ভ্রমণ কাহিনী লেখো।

৪. ছায়াবাজি

- সুকুমার রায়

কবি পরিচিতি

সুকুমার রায় ৩০ শে অক্টোবর ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মাতা বিধুমুখী দেবী। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি শিশু সাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স ছড়া' এর প্রবর্তক। সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কার্য ছাড়াও সুকুমার রায় ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর এক তরুণ নেতা। তার লেখা কবিতার বই 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'গল্প সংকলণ', 'পাগলা দাশু' এবং নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরী' বিশ্ব সাহিত্যে সর্বযুগের সেরা। ১০ ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে এই মহান কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য কবিতায় কবি হাস্যরসের মাধ্যমে ছায়াবাজি কবিতাটি লিখেছেন। এখানে কবি কিছু বাস্তব কথা রসাভাষে কবিতার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন। কিসের ছায়া কিরূপ এবং সময় অনুসারে ছায়া কেমন তাও তিনি এখানে বলেছেন।

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা-
ছায়ার সাথে কুস্তি ক'রে গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি ?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি !
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা।
গ্রীষ্মকালে শুক্নো ছায়া, ভীষণ রোদে ভাজা
চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখ্ছি কত ঘেʼঁটে-
হাল্কা মেঘের পান্‌সে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।

কেউ জানে না এসব কথা কেউ বোঝে না কিছু
কেউ ঘোরে না আমার মত ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অম্‌নি লুটায় ভূ'য়ে,
অম্‌নি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে,
আসল ব্যাপার জান্‌বে যদি আমার কথা শোনো,
বল্‌ছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।

কেউ যবে তার রয়না কাছে, দেখ্‌তে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হ'তে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধর্‌বে তারে ঠেসে।
পাৎলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো-
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌রে ব'লে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাক্‌বে তাহার নাক্।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পার,
শুঁক্‌লে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।
আম্‌ড়া গাছের নোংরা ছায়া কাম্‌ড়ে যদি খায়।
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদ্‌লা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখ্‌ছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি-
দাম করেছি শস্তা বড়, চৌদ্দ আনা শিশি।

শব্দার্থ

আজগুবি = অবিশ্বাস্য	**গাত্র** = শরীর	**সদ্য** = এইমাত্র
ধপাস্ = হঠাৎ পতনের শব্দ	**বাকল** = ছাল	**ব্যামো** = ব্যাধি
তিক্ত = তিতো / তেতো	**ল্যাংড়া** = খোঁড়া	**টাটকা** = তাজা

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

[ ] ← যা হরেক রকম পুঁজি → [ ]

২) রিক্ত ছকে সঠিক শব্দ লেখো।

ক) ছায়ার সাথে কুস্তি করে [ ] হল ব্যথা।

খ) [ ] শুক্‌নো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।

গ) গাছের ছায়া [ ] এদিক ওদিক চায়।

৩) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) চিল গুলো ....,
.... রাখি পুরে।

খ) ....হ'তে এসে,
ধামায় .... ।

গ) পাৎলা ....,
.... ভালো।

৪) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) তেঁতুল তলার	১) মিষ্টি ছায়া
খ) হাল্কা মেঘের	২) নোংরা ছায়া
গ) মৌয়া গাছের	৩) তপ্ত ছায়া
ঘ) আম্‌ড়া গাছের	৪) পানসে্ ছায়া

৫) **কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) বিকাল ×...................... খ) অশান্ত ×......................

গ) অন্ধকার ×...................... ঘ) রৌদ্র ×......................

৬) **কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।**

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) সত্যিকারের কথা কী?

খ) দুপুর বেলায় চিলগুলো কোথায় যায়?

গ) মেঘের ছায়া কেমন হয়?

ঘ) ব্যামো কখন পালায়?

ঙ) কী খেয়ে ঘুমোলে নাক ডাকবে?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'গ্রীষ্মকালে ছায়ার মহত্ত্ব অনেক' - এ বিষয়ে তুমি যা বোঝ তা লেখো।

৯) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম -....................................

খ) কবির নাম -....................................

গ) তোমার পছন্দের দুটি পংক্তি -....................................

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ -....................................

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা -....................................

● সর্বদা মনে রেখো। ●

"পিতা মাতার স্নিগ্ধ ছায়ায় বাড়ে সকল শিশুমন।"

● ভাষাবিন্দু :

অশুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ করে লেখো।

ক) শিসির -...................... খ) ভিষণ -......................

গ) খাচায় -...................... ঘ) মিস্টি -......................

● উপযোজিত লেখন :

'গ্রীষ্ম ঋতু' এ বিষয়ে একটি রচনা লেখো।

৫. বিচার

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালে ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ার হালিশহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা মৃণালিনী দেবী। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি হল ২৪ - পরগণার বনগাঁ মহকুমার বারাকপুর গ্রামে।

লেখক ছিলেন একজন জনপ্রিয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। তিনি মূলতঃ উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী ও অশনি সংকেত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পরে, ১৯৫১ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১ লা নভেম্বর ১৯৫০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

এই গল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা তুলে ধরেছেন। বীরু রায় একজন ঠ্যাঙাড়ে দলের সর্দার ছিল। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রসহ কন্যার বিবাহের টাকা জোগাড় করে ফিরছিলেন। পথে ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়ে সর্বশান্ত হন এবং অবশেষে পুত্রসহ প্রাণ হারান। ঐ দলে বীরু রায়ও ছিল। ঠিক এর এক বছরের মাথায় বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে বাড়ী ফিরছিল। ঘটনাচক্রে সে পথে নিজের একমাত্র পুত্রকে হারায়। লেখকের মতে কোনো এক অদৃশ্য বিচারক তার বিচার সম্পন্ন করলেন।

নিশ্চিন্দিপুরে বীরু রায়ের একটা বড় অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়া ডাঙ্গা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে ঐ সড়কের ধারে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল সোনা ডাঙার মাঠের মধ্যে ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেখানকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুর ধারের প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময় কার্ত্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ

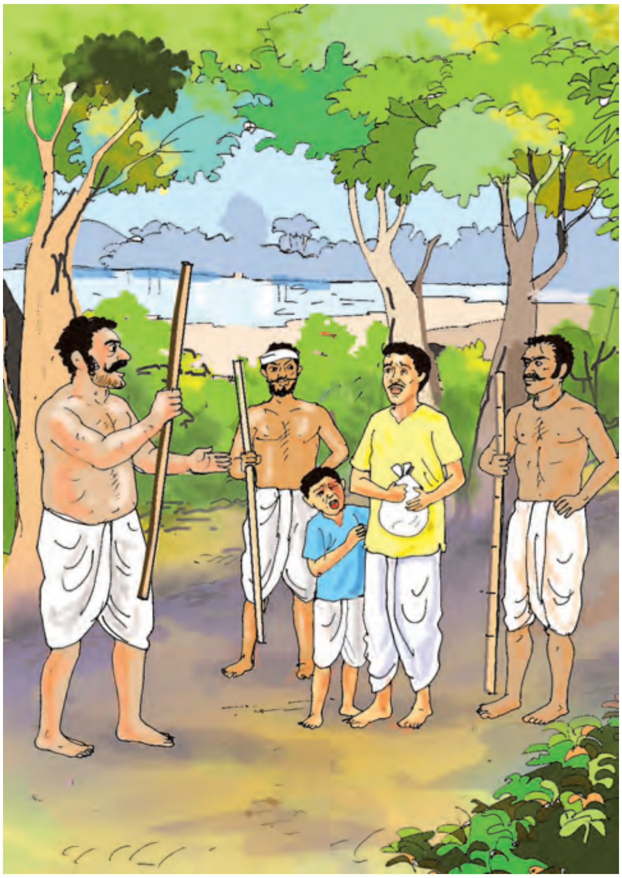

ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচ ক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জের বাজারে, চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল-কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যেই সূর্যকে ডুবু ডুবু। দেখিয়া তাঁহারা দ্রুত পদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন। ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ, অপরে বালক– ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়ে পাল্লা দিবে। অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবন দান- বংশের একমাত্র পুত্র- পিণ্ডলোপ ইত্যাদি।

ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিন দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পরিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে পায়ে পড়িয়া অন্ততঃ পুত্রটির প্রাণ রক্ষার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করেন- কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথা ব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোপাপানা ও শ্যামাঘাসের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশীদিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর, পূজার সময়। বাঙলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড়

নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত, সেখান হইতে আর দিন চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম। সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত, টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দুই দিন পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর মাঝে কাশ ঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়া ছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুই দিন পরে দেশে পৌঁছান যাইবে, বিশেষতঃ পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক চক করিতেছিল। হু হু হাওয়ায় চরের কাশ ফুলের রাশি, আকাশ জ্যোৎস্না মোহনার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দুই একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে বেশ একটা হুটপাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত কন্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনই থামিয়া গেল। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কী দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়াল পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুবিল। চরের সে দিকটা জনহীন-কিছুই কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকী দাঁড়ি মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায়-এর একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নার চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল, কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল- ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝ নদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল - তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশীদিন বাঁচেন নাই।

শব্দার্থ

প্রকাণ্ড = অতি বৃহৎ　**অবিদিত** = অজানা　**প্রস্তাব** = প্রসঙ্গ
আশঙ্কা = ভয়, সংকোচ　**কৌতূহলী** = উৎসুক　**সম্মুখে** = সামনে
নিরুপায় = সহায়হীন, উপায়হীন　**উপস্থিত** = উপনীত　**যথাসর্বস্ব** = সবকিছু
নিষ্পন্ন = সমাপ্ত, মীমাংসিত

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) নিশ্চিন্দিপুরে বীরু রায়ের বড় .... ছিল।
খ) .... গাঙের জল চক্‌চক্‌ করিতেছিল।
গ) বাড়ী আসিয়া .... আর বেশীদিন বাঁচেন নাই।

২) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিল। -..............
খ) বীরু রায় সপরিবারে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হইতে-ফিরিতেছিলেন।-..............
গ) বাঁশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। -..............

৩) কারণ লেখো।

ক) 'নিশ্চিন্দিপুরের বীরু রায়ের একটা বড় অখ্যাতি ছিল।'
খ) 'সকলের মন প্রফুল্ল।'
গ) 'সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যেই সূর্যকে ডুবু ডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।'

৪) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) নিশ্চিন্দিপুর	১) বৃহৎ কুমীর
খ) বেতন ভোগী	২) শ্বশুরবাড়ী
গ) কাশবনের আড়ালে	৩) বীরু রায়
ঘ) বীরু রায় সপরিবার ফেরেন	৪) ঠ্যাঙাড়ে

৫) পাঠ থেকে খুঁজে বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) খ্যাতি ×.......................　খ) পাকা ×.......................
গ) ক্ষুদ্র ×.......................　ঘ) স্বদেশ ×.......................

৬) **পাঠ থেকে খুঁজে শব্দার্থ লেখো।**

ক) বিজন -...................... খ) প্রসঙ্গ -......................

গ) ভয়াতুর -...................... ঘ) কোলাহল -......................

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা কোথায় ছিল?

খ) ব্রাহ্মণ কিসের জন্য অর্থ সংগ্রহে বিদেশে বের হয়েছিলেন ?

গ) বীরু রায় সপরিবারে কোথা থেকে ফিরছিলেন?

ঘ) ব্রাহ্মণ কী বলে পুত্রের জীবনদান করবার জন্য কাকুতি মিনতি করেছিলেন?

ঙ) কুমীর কোথায় ওৎ পেতে ছিল?

৮) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) বীরু রায়ের ছেলেকে কুমীর নিয়ে গেল কী করে?

খ) 'এই ঘটনার বেশীদিন পরে নয়'- এখানে কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে?

৯) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফল"- এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

> ● **সর্বদা মনে রেখো।** ●
> "অদৃশ্যবিচারকের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না।"

● **আমি বুঝেছি :**..

....

● **ভাষাবিন্দু :**

বাক্য সংকোচন :

বাক্য সংকোচন আসলে কোনো বাক্য বা বাক্যাংশকে একসঙ্গে প্রকাশ করা। বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। বাক্য সংকোচন এর মাধ্যমে বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন বা সংকোচন হয় না, বরং অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত থাকে এবং আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

উদাহরণ

ক) পূর্বে যা দেখা যায়নি। - অভূতপূর্ব

খ) অধ্যাপন করেন যিনি। - অধ্যাপক / অধ্যাপিকা

গ) অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা। - অনুবীক্ষণ

ঘ) যার তুলনা হয় না। - অতুলনীয়

ঙ) কখনও যা চিন্তা করা যায় না। - অচিন্তনীয়

৬. শাসকের দুরাচার

- সুভাষচন্দ্র বসু

লেখক পরিচিতি

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭ সালে। তাঁর পিতার নাম জানকী নাথ বসু মাতা প্রভাবতী দেবী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চিরস্মরণীয় নেতা, যিনি এই সংগ্রামে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি নেতাজী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ব্রিটিশদের আক্রমণ করার জন্য 'আজাদহিন্দ ফৌজ' গঠন করে তার নেতৃত্ব প্রদান করেন। সুভাষচন্দ্র পূর্বে প্রায় ২০ বছর জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি স্বরাজ পত্রিকা শুরু করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র বসুর সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি হল "তোমারা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" স্লোগানটি ব্যবহার করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে ১৯৪৫ সালে তাইহোকু থেকে ফেরার সময় বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার মৃত্যু সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও তথ্য পাওয়া যায় নি।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ যে ভাবে ভারতের বুকে তাদের আধিপত্য স্থাপিত করেছিল তার বিষয়ে লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরুপ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের পর যে সাঙ্ঘাতিক অন্যায় এবং দুর্নীতি শুরু হয়েছিল তারই বিস্তৃত বর্ণনা লেখক এই পাঠের মাধ্যমে করেছেন। তিনি এও বললেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে হিন্দু এবং মুসলমানরা সম্মিলিতভাবেই ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং তারপর সমস্ত ভারতবাসীরা তাদের প্রথম মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ সনে। এই যুদ্ধের ফলে বাংলার তৎকালীন স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌলা ক্ষমতাচ্যুত হন। ব্রিটিশ শক্তির ভারত-বিজয় পর্ব তখন থেকেই শুরু হয়েছিল বটে, তবে ধীরে ধীরে এবং ক্রমানুসারী কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই সে-কাজ অগ্রসর হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শাসনাধিকারই ব্রিটিশ-শক্তির হাতে এল, রাজনৈতিক শাসনাধিকার রইল নবার মীরজাফরের হাতে। শেষ মুহূর্তে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইনি ব্রিটিশ-পক্ষে যোগদান করেছিলেন।

ক্রমিক কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই বাংলার সামগ্রিক শাসনভার ব্রিটিশ-শক্তির হাতে এসেছে। ঠিক তেমনিভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল। ধীর গতিতে এইভাবে যখন একদিকে একটার পর একটা জায়গা দখলের কাজ চলছে, অন্যদিকে ব্রিটিশ শক্তি তখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-বিজয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ-পক্ষ যে শুধু অস্ত্রশস্ত্রেরই সাহায্য গ্রহণ করেছিল তা নয়, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতি, এর কোনওটিকেই তারা বাদ দেয়নি। অস্ত্রের থেকে এগুলি আরও বেশী মারাত্মক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী কালে এঁকে লর্ড উপাধি প্রদান করা হয়। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেছেন যে, ইনি জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী ছিলেন। ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। কমন্স-সভার সদস্য এডমন্ড বার্ক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন, তিনি ‘‘সাঙ্ঘাতিক অন্যায় এবং দুর্নীতি’’র অপরাধে অপরাধী।

আমাদের পূর্ববর্তীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা হলো এই যে, ভারতে আগত ব্রিটিশদের চরিত্র এবং কী ভূমিকা তারা গ্রহণ করবে তা তাঁরা গোড়াতেই বুঝতে পারেন নি। অতীতকালে অসংখ্য উপজাতি ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করেছে এবং পরে ভারতবর্ষকেই তাদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো ভেবেছিলেন যে, ব্রিটিশরাও ঠিক এমনই আর একটি উপজাতি। অনেক পরে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটিশরা শুধু রাজ্য জয় আর লুণ্ঠন চালাতেই এদেশে এসেছে, বসবাস করতে আসেনি। সারা দেশের লোক সে-কথা বুঝতে পারা মাত্রই ১৮৫৭ সনে একটি বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাকে ‘‘সিপাহী বিদ্রোহ’’ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সত্যের বিকৃতি ঘটেছে। ভারতবাসীরা মনে করেন যে, এই বিপ্লবই হলো তাঁদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে ব্রিটিশরা এদেশ থেকে প্রায় বিতাড়িত হতে চলেছিল। কিন্তু খানিকটা ভাগ্যক্রমে - শেষ পর্যন্ত তারা জয়লাভ করতে সমর্থ হলো। তারপর শুরু হলো এক বিভীষিকার অধ্যায়, ইতিহাসে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাপক ভাবে হত্যাপর্ব অনুষ্ঠিত হতে লাগলো; হাত-পা বেঁধে নির্দোষ নর-নারীকে

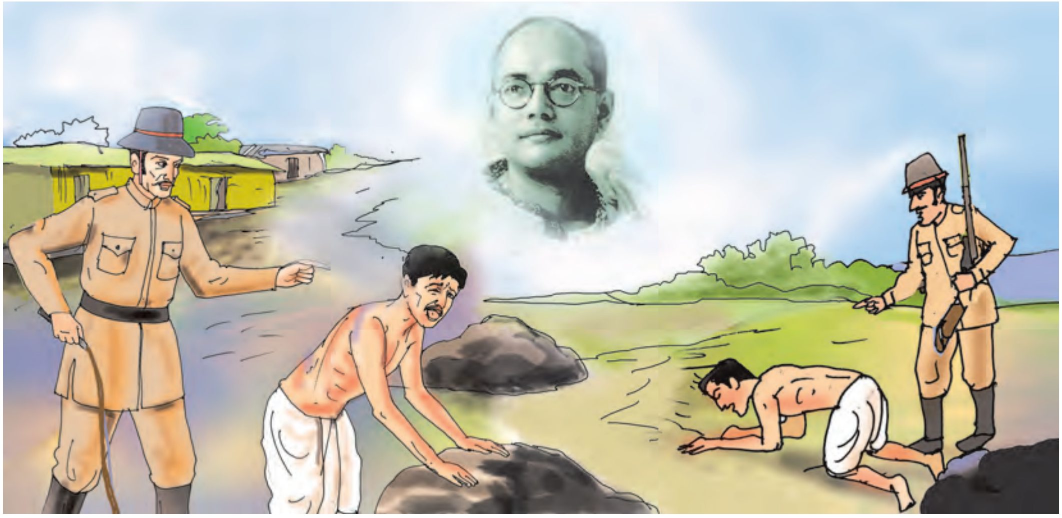

কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করতেও ব্রিটিশরা তখন পেছপা হয় নি।

১৮৫৭ সনের বিপ্লবের পর ব্রিটিশ-পক্ষ উপলব্ধি করতে পারল যে, নিছক পশুশক্তির সাহায্যে খুব বেশীদিন ভারতবর্ষকে অধীন রাখা যাবে না। সুতরাং দেশকে তারা নিরস্ত্রীকৃত করতে অগ্রসর হলো। আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বিতীয় মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা হলো এই যে, সেই নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার কাছে তাঁরা নতি স্বীকার করলেন। এত সহজে যদি তাঁরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ না করতেন তো ১৮৫৭ সনের পরবর্তী ইতিহাসের চেহারা হয়তো অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। গোটা দেশটাকে এই রকম পুরোপুরিভাবে নিরস্ত্রীকৃত করবার ফলেই ব্রিটিশ-শক্তির পক্ষে পরবর্তী কালে একটি সুদক্ষ এবং আধুনিক কালোপযোগী ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার, এ-সরকারের কার্যকলাপ তখন সরাসরি লণ্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাঁদের "ভেদসৃষ্টির সাহায্যে শাসন পরিচালনা" নীতির প্রবর্তন করলেন। তখন থেকেই এই নীতির গোড়াপত্তন এবং ১৮৫৭ সন থেকে অদ্যাবধি এই নীতিটিই হলো ব্রিটিশ শাসনের মূল ভিত্তি। ১৮৫৭ সনের পর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকে সরাসরি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এবং বাকী এক-চতুর্থাংশকে দেশীয় নৃপতিবর্গের অধীনে রেখে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বড় বড় জমিদারদের প্রতিও ব্রিটিশ সরকার যথেষ্টই পক্ষপাত প্রদর্শন করতে লাগলেন। ১৮৫৭ সনের পর দেশীয় নৃপতিদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার যে মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা

যেতে পারে। ১৮৫৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে যেখানে সম্ভব নৃপতিদের উচ্ছেদ করে তাঁদের রাজ্যগুলির প্রত্যক্ষ শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে কয়েকজন— যথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শৌর্যশালিনী ঝাঁসীর রাণী-ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন বটে, তবে অনেকেই নিরপেক্ষ ছিলেন অথবা সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ-পক্ষে যোগদান করেছিলেন। —এই—শেষোক্তদের—মধ্যে একজন হলেন নেপালের মহারাজা। সে-ই সর্বপ্রথম ব্রিটিশদের মাথায় ঢুকল যে, নৃপতিবর্গকে অধিকারচ্যুত করাটা বোধহয় আর ঠিক হবে না; তার চাইতে তাঁদের সঙ্গে বরং একটা মৈত্রী এবং বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করাই ভাল। তাতে করে ব্রিটিশ-শক্তি কখনও কোন অসুবিধেয় পড়লে এই নৃপতিদের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশীয় নৃপতিদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের যে-নীতি ব্রিটিশ-শক্তি গ্রহণ করেছে তার গোড়াপত্তন হয়েছে ১৮৫৭ সনে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবশ্য ব্রিটিশরা বুঝতে পারল যে, নিছক দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং বড় বড় জমিদারকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে আর ভারতবর্ষকে অধীন রাখা যাবে না। সুতরাং ১৯০৬ সনে তারা আবার এক মুসলিম-সমস্যার সৃষ্টি করল। লর্ড মিন্টো তখন ভাইসরয়। এর আগে আর ভারতবর্ষে এরকম কোন সমস্যার অস্তিত্বও ছিল না। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে হিন্দু এবং মুসলমানরা সম্মিলিতভাবেই ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। বাহাদুর শাহ্ মুসলমান; কিন্তু তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতবাসীরা তাদের প্রথম মুক্তি--সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শব্দার্থ

দৃষ্টান্ত = উদাহরণ, নিদর্শন	**ক্রমিক** = ধারাবাহিক	**মারাত্মক** = প্রাণনাশক
উত্থাপন = তুলেধরা	**অভিযোগ** = নালিশ	**সাঙ্ঘাতিক** = মারাত্মক
ভ্রান্তি = ভ্রম, ভুল	**অভ্যুত্থান** = উদয়	**সমর্পণ** = প্রদান, অর্পণ
প্রবর্তন = নতুন সংস্থাপন	**অদ্যাবধি** = আজ পর্যন্ত	**নৃপতি** = রাজা
শেষোক্ত = সর্বশেষে কথিত	**নিছক** = নিতান্ত	**ক্রীড়নক** = খেলনা
অস্তিত্ব = স্থায়িত্ব	**নতিস্বীকার** = পরাজয় স্বীকার	

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যারা সম্মিলিত ভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিল	
	→
	→

২) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

পাঠে ক্রমাগত ব্রিটিশদের নাম
↓
↓
↓

৩) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলা ক্ষমতাচ্যুত হন। -..............

খ) এডমন্ড বার্ক জলিয়াতির অপরাধে অপরাধী ছিলেন। -..............

গ) শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ জয়লাভ করতে সমর্থ হলো। -..............

ঘ) ব্রিটিশ পক্ষ দেশকে নিরস্ত্রীকৃত করতে অগ্রসর হলো না।-..............

৪) কারণ লেখো।

ক) রাজনৈতিক শাসনাধিকার ছিল নবাব মীরজাফরের হাতে।

খ) ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

৫) জোড়া মেলাও।

‘অ’ স্তম্ভ	‘ব’ স্তম্ভ
ক) মারাত্মক	১) সংগ্রাম
খ) মুক্তি	২) অন্যায়
গ) সাঙ্ঘাতিক	৩) শক্তি
ঘ) ব্রিটিশ	৪) ভ্রান্তি

৬) পাঠ থেকে খুঁজে নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) পরাধীন ×...................... খ) অসম্ভব ×......................

গ) দোষ ×...................... ঘ) যুক্ত ×......................

৭) শব্দের অর্থগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

ক) বিদ্রোহ -...................... খ) যুদ্ধ - ....

গ) রাজা -....................... ঘ) স্থায়িত্ব -.......................

৮) **পদ পরিবর্তন করো।**

ক) সম্মিলিত -....................... খ) বিপ্লব -.......................

গ) সক্রিয় -....................... ঘ) উল্লেখ -.......................

৯) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) অস্ত্রের থেকে কী বেশী মারাত্মক?

খ) কমন্স সভায় সদস্য এডমন্ড এর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছিল ?

গ) লেখক কোন ঘটনাকে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলেছেন?

ঘ) নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনের মূল ভিত্তিটি কী ?

ঙ) কাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার পক্ষপাত করতে লাগল?

১০) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) ইংরেজ ঐতিহাসিকদের 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যাটিকে লেখক 'সত্যের বিকৃতি' বলেছেন কেন?

খ) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত কীভাবে ধাপে-ধাপে সম্প্রসারিত হল তা বিবৃত করো।

গ) লেখক তার পূর্ববর্তীদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ঘ) ইংরেজ অনুসৃত ভেদ নীতিটি কী তা লেখো।

১১) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা মনোভাব রাখা উচিৎ'– এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

> **● সর্বদা মনে রেখো। ●**
>
> 'নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না।'

● আমি বুঝেছি :...

....

● ভাষাবিন্দু :

ক) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

ক) নবাব খ) জমিদার গ) মহারাজা ঘ) শৌর্যশালিনী

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

ক) শাসনাধিকার খ) সর্বাপেক্ষা গ) কালোপযোগী ঘ) অদ্যাবধি ঙ) চতুর্থাংশ

● উপযোজিত লেখন :

"স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

৭. বাঙ্গালীর সঙ্গীত

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

কবি পরিচিতি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ : ৫ই নভেম্বর ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভূবন মোহন দাশ মাতা নিস্তরিনী দেবী। তিনি হলেন একজন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও লেখক। সি.আর.দাশ নামে সমধিক পরিচিত এবং সর্বসাধারণ্যে দেশবন্ধু নামে আখ্যায়িত। ১৬ই জুন ১৯২৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবিতাটির মাধ্যেমে কবি বাঙালী জাতির স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালীরা কখনো ভীরু বা কাপুরুষ নয়। বাঙালীর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইতিহাস আছে। এই কবিতায় কবি দেবতাদের প্রসন্নতা, দৈববাণী ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

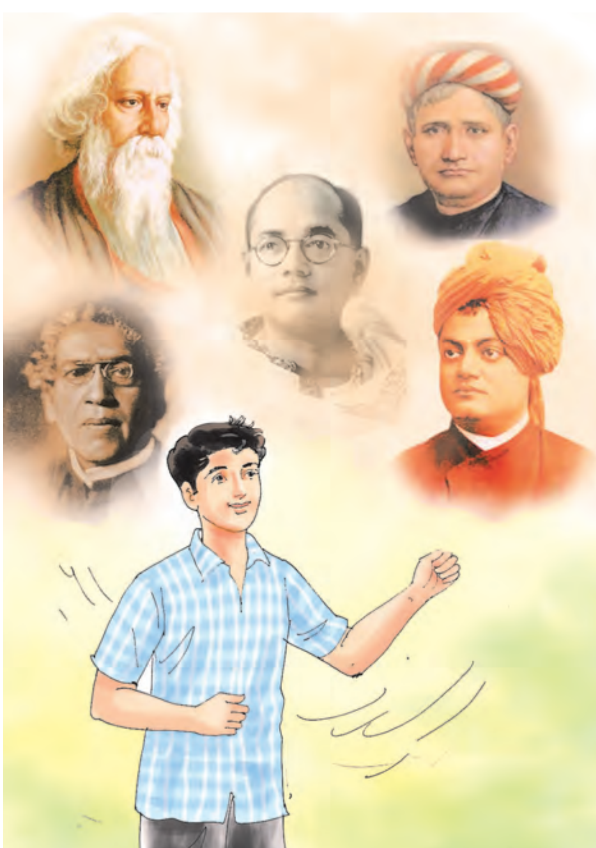

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি, পূর্ণ কর আশ,
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি হিংসা দ্বেষ-বিদ্রুপ-বিলাস,
এই মহামন্ত্র রাখি বক্ষেতে বাঁধিয়া
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
ওই হের দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগনভালে রবিরশ্মি দিয়া-
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস;

ওই শুন, দৈব-বাণী গগনে গর্জিয়া
আলোড়িছে বাঙ্গালীর সর্বপ্রাণমন
আপন কর্মেরে দৃঢ়হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা প্রলোভন।
সঁপিও না সর্ব আশা বিদেশী চরণে-
দূর কর দুর্দিনের মিথ্যা আলাপন,-
সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে।
দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন,
আপন কর্মেরে দৃঢ়হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

শব্দার্থ

ভীরু = ভীতু
দ্বেষ = শত্রুতা, হিংসা
বিদ্রুপ = উপহাস, ঠাট্টা
বিলাস = শৌখিনতা
প্রসন্ন = সন্তুষ্ট
আলিঙ্গন = কোলাকুলি
অলীক = কাল্পনিক

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

বাঙ্গালী নহে → [ ] / [ ]

২) কবিতার পংক্তি পূর্ণ করো।

আজি এ আলোক পূর্ণ .... গাহিছে .... গীতি,
পূর্ণ কর আশ .... নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ।

৩) **উচিৎ জোড়া মেলাও।**

‘অ’ স্তম্ভ	‘ব’ স্তম্ভ
ক) সুন্দর	১) প্রলোভন
খ) গাহিছে	২) আকাশ
গ) দেবতারা	৩) গীতি
ঘ) মিথ্যা	৪) প্রসন্ন

৪) **কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) পাতাল ×...................... খ) অপূর্ণ ×......................

গ) নিরাশা ×...................... ঘ) সাহসী ×......................

৫) **কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) বাঁধিয়া -...................... খ) মরিয়া -......................

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) আলোকপূর্ণ আকাশটি কেমন ?

খ) বাঙ্গালীর কী কী আছে ?

গ) কবি কোন মহামন্ত্রটি বক্ষে বেঁধে রাখার কথা বলেছেন?

৭) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

“স্বদেশের প্রতি ভালবোসা থাকা উচিৎ।”– এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৮) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম -....................................

খ) কবির নাম -....................................

গ) তোমার পছন্দমত দুটি পংক্তি -....................................

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ -....................................

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা -....................................

● সর্বদা মনে রেখো। ●

“সত্যেরে সহায় করতে হয় জীবনে মরণে।”

● ভাষাবিন্দু :

উপসর্গ ও প্রত্যয় - ‘উপসর্গ’ শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়। ‘প্রত্যয়’ শব্দ বা ধাতুর পরে যুক্ত হয়।

উপসর্গ যুক্ত করে শব্দটি পুনঃ লেখো। - ক) পুরুষ খ) লোভন গ) দেশী

● উপযোজিত লেখন :

‘স্বধর্ম পালন আপন কর্তব্য’ - এ বিষয়ে একটি রচনা লেখো।

৮. মাস্টার মশায়

– প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাত্রি গ্রামে জন্মগ্রহ করেন। তার পিতার নাম জয়গোপাল ও মায়ের নাম কাদম্বিনী দেবী। তাঁর পিতা Danapur Railway District এ চাকরি করতেন। তিনি ১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন এবং ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যারিস্টারি পাস করেন। তিনি অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন। রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, জীবনের মূল্য, সিঁদুর কৌটা ইত্যাদি। ১৯৩২ সালে ৫ই এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

'মাস্টার মশায়' গল্পটি প্রভাতকুমারের বিখ্যাত ছোটোগল্পের অন্যতম। এই গল্পটিতে কাদের গ্রামের মাস্টার বেশী ভালো তা নিয়ে পাশাপাশি গ্রামের দু'দলের মধ্যে রেষারেষি হয়। শেষ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় এক হাস্যকর পরিণতির সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিবলে একজন আর একজনকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। গ্রামবাসী ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকায়, বাংলায় ইংরেজি অর্থের তর্জমা শুনে স্থির করে ফেলে, জয় পরাজয়। বুদ্ধিবলে যে অন্যকে পরাস্ত করতে পারা যায় তা এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

কলিকাতা হইতে মাস্টার নিযুক্ত করিয়া গোঁসাইগঞ্জের হীরু চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। মাস্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকার, কৃশকায় ব্যক্তি, বড়ো মিষ্টভাষী। ইংরেজি বলিতে, কহিতে, লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ওস্তাদ। ইংরেজিটা তাঁহার এতই বেশি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তিনি ইংরেজি কথা মিশাইয়া ফেলেন- অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থে আবার তাহার বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরদিনই স্কুল খুলিল। পনেরো-ষোলোটি ছাত্র লইয়া মাস্টার মশায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের দেখা হইলে উভয় গ্রামের মাস্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত –

"বর্ধমানের মাস্টার জানেই বা কী আর পড়াবেই বা কী!" নন্দীপুর বলিত - "হলই বা আমাদের মাস্টারের বাড়ি বর্ধমান, তিনি তো কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন।"

উভয় গ্রামে বারোয়ারি পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা-সংগীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষ্যে উভয় মাস্টারের দেখাসাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং উভয় গ্রামে প্রকাশ পাইল উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত।

পূজাতে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাস্টার নাকি বলিয়াছেন - "ওই বেজা বুঝি ওদের মাস্টার হয়ে এসেছে। ওটা ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা।"

ব্রজ মাস্টার একথা শুনিয়া বলিলেন - "একেই বলে কলিকাল ! সেকেণ্ড বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম ! হয়েছিল কি জান ? মাস্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এনসার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম। মাস্টার আমায় বললে, দাও ওর কান মলে। আমি কান মলে দিতেই ওর মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে গেল। সেই অপমানে ও-ই তো ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ বছর সেই ইস্কুলে পড়ে একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

উভয় মাস্টারের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল হইল এই যে, উভয় গ্রামের লোকই স্ব স্ব মাস্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনো প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচারসভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকই ইংরেজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাস্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরেজি কথার মানে জিজ্ঞাসা-করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ই তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন। বিচারের দিন স্থির হইল- আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা, স্থান-বটবৃক্ষতল, সময়-সূর্যাস্ত।

ধার্য দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন।

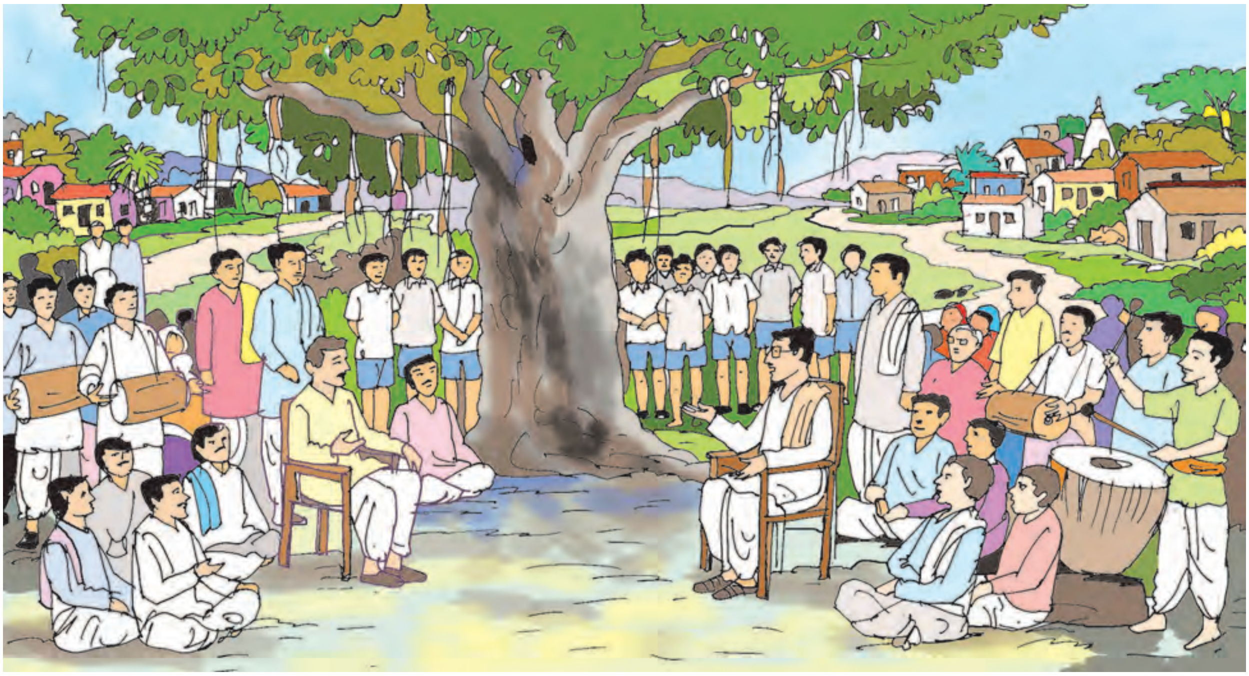

তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাস্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন- ‘‘কি হে মাস্টার, মুখ রাখতে পারবে তো ? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাস্টার যেন তার মানে বলতে না পারে।’’ ব্রজ মাস্টার বলিলেন- ‘‘আপনারা ভাবছেন কেন ? দেখুন না কী করি। এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যা’ শুনে হারাণ মাস্টারের আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে- মানে তো দূরের কথা।’’

দত্তজা বলিলেন - ‘‘দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার তবে, তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।’’

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। দূরে পঙ্গপালের মতো নন্দীপুরবাসীগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদেরও সঙ্গে ঢাক, ঢোল ইত্যাদি অসিতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবি করিল। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু মহাশয় একটি ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে ছুড়িয়া দিবেন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা নত করিয়া পড়িবে সেই গ্রামের মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

হীরু দত্ত মহাশয় ছড়ি সজোরে ঘুরাইয়া উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুরের হারাণ মাস্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাস্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হারাণ মাস্টার তখন বলিলেন- ‘‘আচ্ছা বল দেখি, এর মানে কী - HORNS OF A DILEMMA (হর্নস্ অব্ এ ডায়লেমা)।’’

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাস্টার এই প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন- ‘‘এর মানে- ‘উভয়--সংকট’। কেমন কি-না !’’

‘‘পেরেছে, পেরেছে, আমাদের মাস্টার পেরেছে’’ - গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন।

ব্রজ মাস্টার দাঁড়াইয়া বলিলেন- ‘‘শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেব, সেটা আমার মনঃপূত নয়। আমি যে কথার মানে জিজ্ঞাসা করব - বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা, এর মানে কী বল দেখি - I DON'T KNOW ! (আই ডোন্ট্ নো।)’’

হারাণ মাস্টার উচ্চস্বরে বলিলেন - ‘‘আমি জানি না।’’

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নৃত্য ও চিৎকার করিতে লাগিল - ‘‘হো হো জানে না - নন্দীপুর জানে না - হেরে গেল- দু-ও।’’

হারাণ মাস্টার মহা বিপন্নভাবে সকলকে কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক - ঢোল, কাড়া- নাকাড়া ও রাম শিঙা সমানভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা কাহারও শ্রুতি গোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জের কয়েকজন বলশালী লোক ব্রজ মাস্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারাণ মাস্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জের ব্রজ মাস্টার অপ্রতিহত ভাবে মাস্টারী করিতে লাগিলেন।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ

নিযুক্ত = নিয়োগ	**অভ্যস্ত** = অভ্যাস আছে এমন	**অজ্ঞ** = মূর্খ
অধ্যাপনা = শিক্ষাদান	**উদ্বিগ্ন** = শঙ্কিত	**অনভিজ্ঞ** = আনাড়ি, অজ্ঞ
আক্কেলগুড়ুম = স্তম্ভিত	**ওস্তাদ** = দক্ষ	**রামশিঙ্গা** = বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

[ ] ← বাদ্য যন্ত্র → [ ]

২) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

গোঁসাইগঞ্জের মাস্টার
↓
[ ]
↓
[ ]
↓
[ ]

৩) কারণ লেখো।

ক) মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে গেল।

খ) বটবৃক্ষের নিম্নে বিচারসভা বসবে।

৪) পাঠ থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) ছোট X...................... খ) সমাপ্ত X......................

গ) পরাজয় X...................... ঘ) নরম X......................

ঙ) এনসার X.................... চ) সহজ X......................

৫) পাঠ থেকে শব্দার্থ খুঁজে লেখো।

ক) বাঁধিয়া -...................... খ) বেরনো -......................

গ) শান্ত -...................... ঘ) দক্ষ -......................

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) গোসাইগঞ্জের মাস্টার মহাশয়ের নাম কি ছিল?
খ) উভয় গ্রামে কোন পূজা আরম্ভ হয়েছিল ?
গ) গ্রামের লোকেরা কোন ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিল ?
ঘ) ব্রজ মাস্টার হারাণ মাস্টারকে অবশেষে কি প্রশ্ন করলেন ?

৭) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) উভয় গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা কী আলোচনা করতেন?
খ) নন্দীপুরের মাস্টার মহাশয়ের কথা শুনে ব্রজ মাস্টার মহাশয় কী বলেছিলেন?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"জীবিকার সুবিধার্থে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান থাকা দরকার।" – এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

● সর্বদা মনে রেখো। ●
"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিৎ।"

● **আমি বুঝেছি :**...
....

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

ক) খর্বাকার -........................ খ) আক্কেলগুড়ুম -........................
গ) সূর্যাস্ত -........................ ঘ) ঈশ্বরেচ্ছা -........................

● **উপযোজিত লেখন :**

কাহিনী লেখন - তোমার পছন্দ মত একটি কাহিনী তোমার ভাষায় লেখো।

৯. সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার

- অরূপ মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

অরূপ মুখোপাধ্যায় একজন বাঙালী লেখক পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে - তাঁর জীবনীকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্প নির্দেশক, সংগীত পরিচালক এবং লেখক সত্যজিৎ রায়ের শান্তিনিকেতনের শৈশব স্মৃতি, লেখক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। খুব কম বয়সে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এই অধ্যায়ে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে যে দৃশ্য উপস্থিত হয়েছিল তা খুব স্পষ্টভাবে চিত্রণ করা হয়েছে।

অরূপ - আপনার জন্ম সাল ?

সত্যজিৎ - ১৯২১।

অরূপ - কোথায় ?

সত্যজিৎ - কলকাতায় গড়পাড়ে।

অরূপ - বাড়ির ঠিকানা ?

সত্যজিৎ - যতদূর মনে পড়ে ১০০ এ গড়পাড় রোড, আপার সার্কুলার রোড থেকে ঢুকেই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলের ঠিক পিছনেই। আমার ঠাকুরদাদা উপেন্দ্র কিশোর।

অরূপ - আপনাদের গড়পারের বাড়িতে আর কে কে ছিলেন ?

সত্যজিৎ - বাবা (সুকুমার রায়) তো মারা যান আমার আড়াই বছর বয়সে। আমার মেজো কাকু সুবিনয় রায়, ছোট কাকু সুবিমল রায়, সেজো কাকার স্ত্রী, তাঁর ছেলে, আমার ঠাকুমা মানে উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী।

অরূপ - সোজা কথায় একটি সাবেক যৌথ পরিবার ?

সত্যজিৎ - হ্যাঁ, আমি, মা আর আমার দাদু কুলদারঞ্জন- উনি থাকতেন এক তলায়, মুগুর ভাঁজতেন, বেশ মনে আছে।

অরূপ - ছ-বছর বয়সে আপনি যখন চলে এলেন, তার কত পরে এবং কোথায় হাইস্কুলে গিয়েছিলেন ?

সত্যজিৎ - আমার তো একটাই হাইস্কুল, একটাই কলেজ– বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ও তার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ। আমি স্কুলে ভর্তি হই বছর দশেক বয়সে। একটু দেরিতে। তার আগে আমি বাড়িতে পড়তাম মার কাছেই।

অরূপ - স্কুল ছাড়লেন কোন বছর ?

আমি থার্টি-সিক্সে ম্যাট্রিক দিই। তার পর প্রেসিডেন্সি থেকে নাইন্টিন ফোর্টিতে বি.এ.- তার পর শান্তিনিকেতন কলা ভবনে আড়াই বছর।

অরূপ - রবীন্দ্রনাথকে আপনি প্রথম কবে দেখেছিলেন ? মনে আছে ?

সত্যজিৎ - সাত-আট বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম কবিকে দেখি। একটা অটোগ্রাফ খাতা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে তিনি লিখে দিয়েছিলেন। সেই বিখ্যাত কবিতা

বহুদিন ধরে’ বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিশের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

অরূপ - শান্তিনিকেতনে পাকাপাকি ভাবে ভর্তি হলেন কী ভাবে ?

সত্যজিৎ - আমার মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আমি শান্তি নিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে চিত্রকলায় শিক্ষা লাভ করি। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ.পাশ করার পর ১৯৪০ সালে আমি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হই। এর পর চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলাম। কিন্তু তিন বছর থেকে ১৯৪৩ সালে কলাভবনের পুরো কার্যক্রম শেষ না করে চলে আসি। এর মধ্যে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ তো চলেই গেলেন।

অরূপ - রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন।

সত্যজিৎ - সকাল বেলায় ওখানে (শান্তিনিকেতনে) একটা টেলিফোন গেলো। খালি পায়ে ছিলাম। খালি পায়েই চলে এলাম - আমি, কৌশিক- চার পাঁচ জন।

অরূপ - শান্তিনিকেতনে কী রকম আবহাওয়া তখন?

সত্যজিৎ - সবাই বাড়ির বাইরে মাঠে বসে রয়েছে। তার চেয়েও বেশি যেটা মনে আছে রবীন্দ্রনাথ যেদিন চলে যাচ্ছেন – সেটা খুব টাচিং । আমরা অত কাছে যেতে পারিনি, অনেকে বললে – ওঁর চোখে জল দেখলাম। কেউ কখনো ওঁর চোখে জল দেখেনি। সেদিন মৃত্যুর দিন আমার পরনে ছিল পাঞ্জাবি ও পায়জামা, পকেটে একটা দশ টাকার নোট ছিল। সেটা আবার জোড়াসাঁকোর সামনে কে পকেট মেরে দিল ভিড়ের মধ্যে। তারপর সেই জোড়াসাঁকো থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আমরা হেঁটে ফিরলাম। বৃষ্টি নামল মাঝে। শান্তিনিকেতনের লোক বলে আমাদের আবার সেদিন ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। অন্য লোকেদের বাইরে থেকে, তাতে প্রচণ্ড একটা আপত্তি। তারপর তো রবীন্দ্রনাথের দাড়ি - ফাড়িও ছিড়ে নিল - সেও দেখলাম। যখন ওঁকে কাঁধে তুললো তখন একটা টেরিফিক (ব্যাপার) হয়েছিল, বীভৎস রকম। নন্দলালবাবু সাজাচ্ছেন সাদা ফুল দিয়ে, দেখলাম। তার পরের বছর ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিই।

শব্দার্থ

যৌথ = মিলিত, যুক্ত	**ব্যয়** = খরচ	**আপত্তি** = অসম্মতি
সিন্ধু = সমুদ্র	**প্রচণ্ড** = ভীষণ	**সান্নিধ্যে** = সামীপ্যে
বীভৎস = বিশ্রী	**সাক্ষাৎকার** = মোলাকাত, পরস্পরে আলাপ	

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

[ ] ← সত্যজিৎ রায় যাঁদের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। → [ ]

২) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

সত্যজিৎ রায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে চলতে থাকে
↓
[ ]
↓
[ ]
↓
[ ]
↓
[ ]

৩) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো ।

ক) ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। -.........................

খ) নন্দলাল বাবু কাগজ দিয়ে সাজাচ্ছিলেন। -.........................

গ) সত্যজিৎ রায়ের বাবার নাম সুকুমার রায়। -.........................

ঘ) সত্যজিৎ রায় নাইন্টিন ফোর্টিতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। -.........................

৪) **কারণ লেখো।**

ক) সবাই বাড়ির বাইরে মাঠে বসে রয়েছে।

খ) সত্যজিৎ রায়কে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল।

৫) **উচিৎ জোড়া মেলাও।**

‘অ’ স্তম্ভ	‘ব’ স্তম্ভ
ক) মেজো কাকু	১) গভর্নমেন্ট হাইস্কুল
খ) বালিগঞ্জ	২) সুবিনয় রায়
গ) পকেট	৩) নন্দলাল বসু
ঘ) চিত্রশিল্পী	৪) দশ টাকা

৬) **পাঠ থেকে খুঁজে শব্দগুলির অর্থ লেখো।**

ক) সমাপ্ত -....................... খ) আকাঙ্ক্ষা -.......................

গ) প্রবেশ -....................... ঘ) বিলম্ব -.......................

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) সত্যজিৎ রায় বাড়িতে কার কাছে পড়তেন ?

খ) রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম কোথায় দেখেছিলেন ?

গ) কোন মাসে সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতন ছেড়ে দেন?

৮) **সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

ক) সত্যজিৎ রায়ের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যা জানো তা লেখো।

খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসের সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

৭) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

“মহাপুরুষের জীবনী পাঠের একান্ত প্রয়োজন” – এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

● সর্বদা মনে রেখো। ●

“পরিশ্রমের ফল খুব মিষ্টি হয়।”

● **আমি বুঝেছি :**...

....

● **উপযোজিত লেখন :**

‘চলচ্চিত্র জগতে বাঙালীর অবদান’ - এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখো।

১০. রাঙাচুড়ি

- কালিদাস রায়

কবি পরিচিতি

কবি কালিদাস রায় ২২শে জুন ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলায়। পিতা যোগেন্দ্রনাথ রায়, মাতা রাজবালা দেবী। কালিদাস রায় ছিলেন রবীন্দ্রযুগের বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুসারী কবি, প্রাবন্ধিক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে কুন্দ, কিশলয়, ক্ষুদকুঁড়া ও পুর্নাহুতি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। গ্রাম বাংলার রূপকল্প অঙ্কনের প্রতি আগ্রহ বৈষ্ণব প্রবণতা ও সামান্য তত্ত্বপ্রিয়তা ছিল তাঁর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত। ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য কবিতায় কবি পিতা ও কন্যার এক আবেগঘন ঘটনা তুলে ধরেছেন। পিতা মেয়ের জন্য উৎসবের দিনে উপহার স্বরূপ রঙীন চুড়ি এনে দিলেন। সেই চুড়ি পেয়ে মেয়েটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মণ্ডপে-মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু হঠাৎ পড়ে গিয়ে চুড়ি ভেঙ্গে যাওয়ায় সে রাস্তায় পড়ে কাঁদতে থাকে। চুড়ির মূল্য সামান্য হলেও পছন্দের জিনিস মহামূল্যবান হয়ে ওঠে। দরদের জিনিসকে কোনদিন সোনা-রূপার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাই চুড়ি বিনা বালিকাপ্রাণ পূজার দিনে একদম অন্ধকার হয়ে গেছে।

পিতা ফিরিলেন বাড়ি, রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ি
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি হাতে সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে-ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ-পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধুলায়,
ভাঙিয়া কাচের চুড়ি একেবারে হল গুঁড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধুলা ঝাড়ি ফিরিতে চাহে না বাড়ি
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া,

ভাঙা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া-লুটিয়া।
পিতা আসি তুলে বুকে বলে, চুমা দিয়ে মুখে,
“গেছে যাক, ভারি এর দাম।”
থামেনাকো কোন মতে তবু খুকি শুয়ে পথে
ফুঁপে-ফুঁপে কাঁদে অবিরাম।
ব্যথা কী বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায়-আনায়?
দরদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন,
মিলিবে কি রুপায়-সোনায়?
সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান-খান,
বল কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভূবন আঁধার।

শব্দার্থ

তরে = জন্যে
পানে = দিকে
ভারি = খুব বেশি
অবিরাম = অনবরত
আঁধার = অন্ধকার
আমোদে = আনন্দে
ক্ষতেরে = ক্ষতস্থানকে
দাম = মূল্য
তুচ্ছ = হেয়
ভূবন = পৃথিবী

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

পিতা মেয়েটির জন্য যা-যা আনিলেন	

২) কবিতা থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) উঠিবেনা .... ঝাড়ি ফিরিতে চাহে না ....।

খ) কাঁদে শুধু .... ছাড়ি দিয়া।

গ) ভাঙা চুড়ি .... জোড়া দেয় ....।

ঘ) করে, পথে ....।

৩) কবিতা থেকে অপূর্ণ পংক্তিগুলি পূর্ণ করো।

ক) ব্যথা কী বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা ....।

খ) দরদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন, ...।

৪) জোড়া মেলাও।

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) রাঙাচুড়ি	১) একেবারে হল গুঁড়ি
খ) শানাই শুনিয়া কানে	২) ক্ষতেরে ভুলায়
গ) ভাঙিয়া কাচের চুড়ি	৩) রাঙা শাড়ি
ঘ) ক্ষতি তার	৪) পূজার মণ্ডপ পানে

৫) নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে লেখো।

ক) উঠিল ×...................... খ) লাভ ×......................

গ) হাসে ×...................... ঘ) কাল ×......................

ঙ) আলো ×...................... চ) রাতে ×......................

ছ) ভাঙা ×...................... জ) শ্রেষ্ঠ ×......................

৬) নীচে দেওয়া শব্দগুলির লিঙ্গান্তর করো।

ক) মাতা -...................... খ) ছেলে -......................

গ) খোকা -...................... ঘ) বালক -......................

৭) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো : (বাড়ি-শাড়ি)

৮) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একবাক্যে উত্তর লেখো :**

ক) মেয়েটি ছুটে কোথায় যাচ্ছিল ?
খ) কে গলা ছেড়ে কাঁদছিল ?
গ) মেয়েটিকে ধুলা থেকে কে তুলেছিলেন ?
ঘ) কারা ব্যথা বুঝবে না ?
ঙ) কবি দরদের ধনকে কীসের থেকে দামি বলতে চেয়েছেন ?

৯) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"দরদের জিনিস তুচ্ছ হলেও তা অমূল্য" – এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

১০) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম -......................................
খ) কবির নাম -......................................
গ) তোমার পছন্দমত দুটি পংক্তি -......................................
ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ -......................................
ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা -......................................

● **সর্বদা মনে রেখো।** ●
'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপ
পিতোরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা।'

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) পদ পরিবর্তন করো।

ক) রাঙা -........................ খ) ব্যথা -........................
গ) অবিরাম -........................ ঘ) সমগ্র -........................
ঙ) দিন -........................ চ) দাম -........................

খ) বাক্যের প্রকার লেখো।

ক) উঠিবে না ধুলা ঝাড়ি। খ) গেছে যাক ভারি এর দাম !
গ) কেবা দিবে দাম তার ?

● **উপযোজিত লেখন :**

প্রবাসী পিতাকে দূর্গা পূজার উপহার নিয়ে আসার জন্য আবদার জানিয়ে পত্র লেখো।

১১. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী

- সংকলিত

রামকৃষ্ণ দেবের পরিচয়

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ সালে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবীর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ সন্তান। সন্তানসম্ভবা চন্দ্রমণি দেবী দেখেছিলেন শিবলিঙ্গ থেকে নির্গত একটি জ্যোতি তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছে। তার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে গয়ায় তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে ক্ষুদিরাম গদাধর বিষ্ণুকে স্বপ্নে দর্শন করেন। সেই কারণে তিনি নবজাতকের নাম রাখেন গদাধর। তিনি ১৮৫৬ সালে রাণী রাসমণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত হন । যদিও তিনি মা সারদা দেবীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে বিশ্ব দরবারে পরমহংস নামে খ্যাত হন। তিনি বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং সর্বশেষে 'যত মত তত পথ' নামক এক বিশেষ পথের সন্ধান মানবসমাজকে প্রদান করেন। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতকের এক প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরই প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর শিষ্য সমাজে, এমনকি আধুনিক ভক্ত সমাজে তিনি ঈশ্বর অবতার রূপে পূজিত হন। ১৬ই আগস্ট ১৮৮৬ সালে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে রামকৃষ্ণ দেবের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া সমাজ উপযোগী কিছু অমূল্য বাণীকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সকল গুণগুলি থাকা আবশ্যক তা তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে অতি সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়েছেন।

- অভিজ্ঞতা একটি কঠিন শিক্ষক, সে প্রথমে পরীক্ষা নেয় পরে পাঠ দেয়।
- সফলতা অন্যের দ্বারা ঠিক করে দেওয়া উপায় মাত্র কিন্তু সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা ঠিক করে দেওয়া উপায়।
- যদি তুমি কর্ম করো, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তিভাব থাকা আবশ্যক। একমাত্র তখন সেই কর্ম সার্থক হতে পারে।
- যতদিন জীবন আছে আর তুমি জীবিত আছো, শিখে যাও।
- যদি তুমি পূর্ব দিকে যেতে চাও, তাহলে কখনই পশ্চিম দিকে যেও না।

- ভালোবাসার মাধ্যমে ত্যাগ এবং বিবেক স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে।
- বিনা কোনো স্বার্থ ছাড়া কাজ যেই মানুষ করেন, সে বাস্তবে নিজের ভালোই করে চলেছেন।
- নিজের বিচার গুলির উপর সৎ থাকো ও বুদ্ধিমান হও; নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করো।
- ‘‘যত্র জীব তত্র শিব’’ অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যেই ভগবানের বাস, তাই জীব সেবাই হলো শিব সেবা।
- একমাত্র জ্ঞান, দয়া, প্রেম ও ভক্তি মানুষের চৈতন্যকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম।
- যদি তুমি মনের মধ্যে অহংকারের কালো মেঘ পুষে রাখো স্বয়ং ঈশ্বরও তোমায় আলোর পথ দেখাতে পারবেনা।
- লোভী মানুষের মন অনেকটা নর্দমায় বেড়ে ওঠা কীটের মতো, তাকে যতই ভালো জায়গায় রাখো না কেন সে তো ফিরে নর্দমায় যাবেই।
- যখন ফুল ফোটে তখন মৌমাছিরা আপনা থেকেই চলে আসে; ঠিক তেমনই যখন আমরা প্রসিদ্ধ হয়ে যাই তখন সমস্ত মানুষ আপনা থেকেই আমাদের গুণগান করতে শুরু করে দেয়।
- তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কি লাভ—যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই একজনের কাছে।
- যত মত তত পথ।
- লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়।
- মনের মধ্যে কখনও লোভ ক্ষোভ, হিংসা পুষে রেখো না কারণ মন হল মন্দির সেখানে থাকবে শুধু ঈশ্বরের নাম, ভক্তি ও প্রেম।

১২. কালকেতুর ভোজন

- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবি পরিচিতি

মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবি। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৫৪০ সালে। পিতা ছিলেন হৃদয় মিশ্র ও মাতা দৈবকী। কাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি কবিকঙ্কণ উপাধি পান। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে বিখ্যাত। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নাম 'অভয়া মঙ্গল'। ১৬০০ সালে পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান জেলায় দামুন্যা গ্রামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য কবিতায় কবি হাস্যের ছলে তৎকালীন সমাজের নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীর খাদ্য তালিকা তুলে ধরেছেন। কবিতার ভাষা-শৈলী অতি প্রাচীন। কালকেতু একজন বলশালী ও ভোজন রসিক ব্যক্তি। তার ভোজনের পরিমাণ দেখে বোঝা যায় তিনি কত বড় শূরবীর। আহারের তালিকায় বিভিন্ন ধরণের ব্যঞ্জন ও পানীয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে ধারনার বাইরে। এখানে খেতে বসার আগে এবং খাবার পরে নিয়ম ও পদ্ধতিরও উল্লেখ আছে।

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।।
বোঁচা নারিকেলের পুরিয়া দিল জল।
করিল ফুল্লরা তবে ভোজনের স্থল।
চরণ পাখালি বীর জল দিল মুখে।।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে।।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিলা নুতন খাপরা।
মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাড়ি আমানি উজাড়ে।
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাণ্ডি মুসুরি সুপ মিশ্যা তথি লাউ।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।

কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া।
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে,
রন্ধন করাছ ভালো আর কিছু আছে।
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাড়ি,
তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাড়ি।
শয়ন কুতসিত বীরের ভোজন বিটকাল,
গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল।।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন,
হরীতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন।
নিশাকাল হৈল বীর করিলা শয়নে,
নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত।

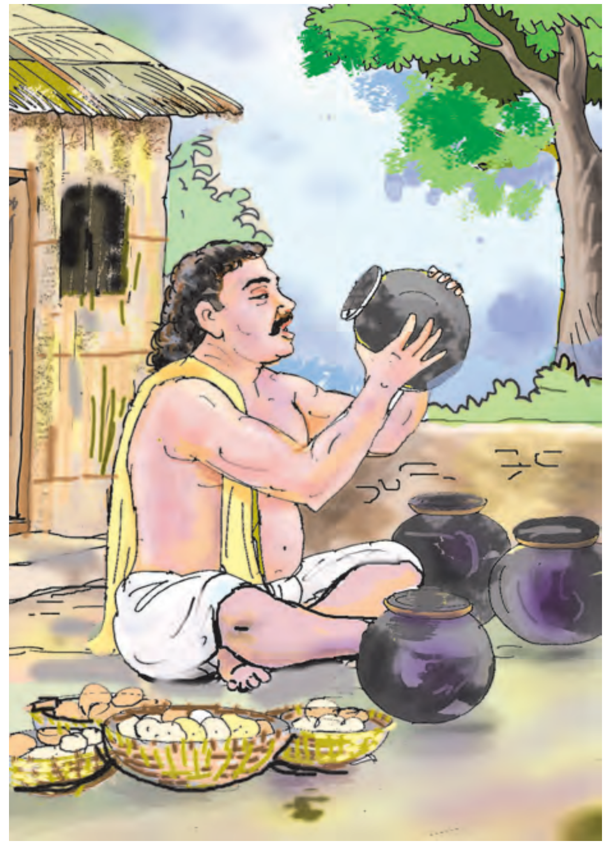

শব্দার্থ

পাল্য = পেল	**খুদ জাউ** = চালের কণা রান্না	**ছড়া** = ছাল
চরণ পাখালি = পা ধোওয়া	**সম্ভ্রমে** = সম্মানে	**বনিতা** = স্ত্রী, পত্নী
পাথরা = পাথরের থালা	**বিটকাল** = বিকট	**হাণ্ডি** = হাঁড়ি
আমানি = পান্তা ভাতের জল	**আচমন** = হাত-মুখ ধোয়া	

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

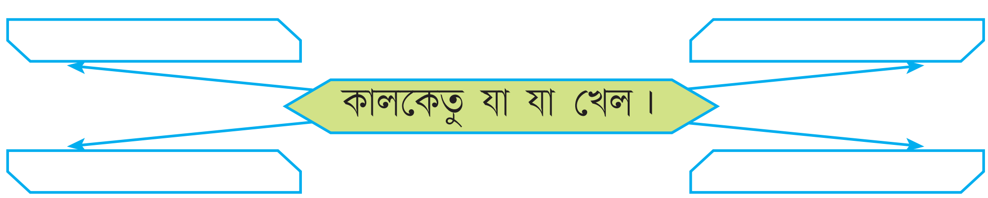

২) শূণ্য স্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

ক) করিল ফুল্লরা তবে ..... স্থল। খ) চারি হাড়ি .... খায় খুদ জাউ।

গ) কচুর সহিত খায় ..... আমড়া। ঘ) অম্বল খাইয়া বীর .... পুছে।

৩) **অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।**

ক) ভোজন করিতে ....। খ) মোচড়িয়া গোঁফ ....।

গ) ছয় হাণ্ডি ....। ঘ) রন্ধন করা .... ।

ঙ) শয়ন কুতসিত ....।

৪) **শব্দগুলির অর্থ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) থালা -...................... খ) পত্নী -......................

গ) হাঁড়ি -...................... ঘ) বিকট -......................

ঙ) সম্মানে -......................

৫) **বিপরীত শব্দগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) নিকট ×...................... খ) কাপুরুষ ×......................

গ) পুরাতন ×...................... ঘ) সুন্দর ×......................

৬) **কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো। (সাড়া - ছাড়া)**

৭) **একবাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কালকেতুকে ফুল্লরা কীসে বসতে দিল?

খ) গোঁফ দুটি কোথায় বাঁধলো?

গ) কালকেতু এক শ্বাসে কত হাড়ি আমানি খেয়েছিল?

ঘ) কচুর সঙ্গে কী কী খেয়েছিল? ঙ) ভোজন শেষে কী খেলো?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

''অতিরিক্ত আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'' – এ বিষয় তোমার অভিমত প্রকাশ করো।

৯) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম -...................................

খ) কবির নাম -...................................

গ) তোমার পছন্দমত দুটি পংক্তি -...................................

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ -...................................

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা -...................................

● সর্বদা মনে রেখো। ●

''অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে চেনা যায়।''

● উপযোজিত লেখন :

'খাদ্য রসিক' –এ বিষয়ে একটি গল্প লেখো।

দ্বিতীয় বিভাগ

১৩. ছন্দে শুধু কান রাখো

- অজিত দত্ত

কবি পরিচিতি

কবি অজিত দত্তের জন্ম ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার বিক্রমপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশ) পিতা অতুল কুমার দত্ত, মাতা হেমালিনী দেবী। কবির ছদ্মনাম রৈবতক। কবি অজিত দত্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলা এবং সংস্কৃত নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং এম.এ.পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৬ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপনায় যোগদান করেন। বুদ্ধদেব বসুর সহযোগী হিসাবেই বাংলা সাহিত্য জগতে অজিত দত্তের আবির্ভাব। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল কুসুমের মাস, পাতাল কন্যা, নষ্টচাঁদ, পুনর্নবা, ছায়ার আলপনা প্রভৃতি। কবির মৃত্যু ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

কবিতা প্রসঙ্গ

আলোচ্য কবিতায় কবি ছন্দে মন দিতে বলেছেন কারণ যারা কান এবং মন দিয়ে ছন্দ শুনবে তারা ছন্দ ও সুরের সংকেতের মাধ্যমে পৃথিবীকে নতুন করে চিনবে। তাদের মনের মাঝে জমবে মজা, আনন্দ এবং জীবন হয়ে উঠবে পদ্যময়। দ্বন্দ্ব-বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে প্রকৃত ও সমাজের গোপন সুর ও ছন্দকে অনুধাবন করতে পারলে পদ্য লেখাও সহজ হয়ে যায়। কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি পাঠককে তার পারিপার্শ্বিক জগতকে বোঝার জন্য যাবতীয় ছন্দের প্রতি মনোযোগী হতে প্রেরণা দিয়েছেন।

মন্দ কথায় মন দিয়ো না
ছন্দে শুধু কান রাখো,
দ্বন্দ্বে ভুলে মন না দিলে
ছন্দ শোনা যায় নাকো।
ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে
ছন্দ আছে জোছনাতে,

দিন দুপুরে পাখির ডাকে
ঝিঁঝির ডাকে ঘোর রাতে।
নদীর স্রোতের ছন্দ যদি
মনের মাঝে শুনতে পাও
দেখবে তখন তেমন ছড়া
কেউ লেখেনি আর কোথাও
ছন্দ বাজে মোটর চাকায়
ছন্দে চলে রেলগাড়ি
জলের ছন্দে তাল মিলিয়ে
নৌকো জাহাজ দেয় পাড়ি।
ছন্দে চলে ঘড়ির কাঁটা
ছন্দে বাঁধা রাত্রি-দিন,
কান পেতে যা শুনতে পাবে
কিচ্ছুটি নয় ছন্দহীন।
সকল ছন্দ শুনবে যারা
কান পেতে আর মন পেতে
চিনবে তারা ভুবনটাকে
ছন্দ সুরের সংকেতে।
মনের মাঝে জমবে মজা
জীবন হবে পদ্যময়,
কান না দিলে ছন্দে জেনো
পদ্য লেখা সহজ নয়।

শব্দার্থ

মন্দ = খারাপ
বাদল = মেঘ ও বৃষ্টি
দ্বন্দ্ব = ঝগড়া
জোছনা = জ্যোৎস্না
স্রোত = প্রবাহ
পদ্য = কবিতা
ভুবন = পৃথিবী
সংকেত = ঈঙ্গিত, ইশারা
মজা = আনন্দ
ছড়া = ছোটদের কবিতা।

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

ছন্দ আছে	→
	→

২) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

মন্দ কথায় কান দিয়োনা
↓
↓
↓

৩) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) দিন দুপুরে ....।   খ) ছন্দ বাজে ....।

গ) ছন্দে চলে ....।   ঘ) ছন্দে বাঁধা ....।

ঙ) মনের মাঝে ....।

৪) কবিতা থেকে খুঁজে নীচে দেওয়া শব্দের অর্থ লেখো।

ক) খারাপ -......................   খ) প্রবাহ -......................

গ) পদ্য -......................   ঘ) ঝগড়া -......................

ঙ) আনন্দ -......................

৫) কবিতা থেকে খুঁজে নীচে দেওয়া শব্দের বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) দিন ×......................   খ) ভালো ×......................

গ) মরণ ×......................   ঘ) কঠিন ×......................

৬) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো: (দিলে - বদলে)

ক) ....   খ) ....

গ) ....   ঘ) ....

ঙ) ....   চ) ....

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) কবি মন্দ কথায় কেন কান দিতে বারণ করেছেন?

খ) নৌকা জাহাজ কীভাবে পাড়ি দেয় ?

গ) কান পাতলে কী শোনা যাবে বলে কবি মনে করেন?

ঘ) কারা কীভাবে ভুবনটাকে চিনবে?

ঙ) সহজে পদ্য লিখতে গেলে কীসের প্রয়োজন?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"জীবন ছন্দময় হওয়া উচিত।"– এই মন্তব্য সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করো।

৯) **নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।**

ক) কবিতার নাম –.....................................

খ) কবির নাম –.....................................

গ) তোমার পছন্দের যে কোন দুটি পংক্তি –.....................................

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দের কারণ –.....................................

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা –.....................................

> ● **সর্বদা মনে রেখো।** ●
>
> "জীবনের প্রতিটি কাজের অনুশীলনে থাকে ধারাক্রম বা ছন্দ।"

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) পদ পরিবর্তন করো।

ক) ঝড় - .... খ) মন - ....

গ) সুর - .... ঘ) দিন - ....

ঙ) সংকেত - ....

খ) অশুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ করে লেখো।

ক) দন্দ - .... খ) ছন্দ্ব - ....

গ) সনকেত - .... ঘ) সোত - ....

● **উপযোজিত লেখন :**

'ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

১৪. বটগাছ ও মানুষের পত্র

- ড. জীতেন্দ্র পাণ্ডেয়

লেখক পরিচিতি

লেখক ড.জিতেন্দ্র পাণ্ডেয় ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম স্বর্গীয় রামবুঝ পাণ্ডেয় ও মাতার নাম স্বর্গীয় রাজেশ্বরী পাণ্ডেয়। হিন্দি ও সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ.পাশ করেন ও মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত করেন। হিন্দি বিকাস পরিষদ থেকে একাধিক সম্মান লাভ করেন। এনার প্রকাশিত রচনা 'কবিতা মে জীবন', 'দেখা জব স্বপ্ন সাবেরে', 'সাহিত্য কা মসীহা', 'পত্র পত্রিকা প্রভৃতি'।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য 'পত্র পাঠে' বৃক্ষ-ধ্বংসের দুষ্পরিনাম তুলে ধরা হয়েছে। গাছ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। যারা গাছ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না, তারা শীঘ্রই এমন একটি পৃথিবীতে বাস করবে যা মানুষকে ধরে রাখতে পারবে না। প্রাকৃতিক সাম্যতা বজায় রাখতে গাছ পালা, পশু-পাখি, জল-বাতাস সকলের সমান ভূমিকা রয়েছে। 'গাছ থাকলেই প্রাণ থাকবে' এই কথাটি সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

প্রিয় মানব,

আমি অতি বেদনার সহিত এই পত্রখানা লিখছি। আমাকে রক্তের অশ্রুজলে কাঁদিওনা। ওহে মানব আমাকে কেটো না। আমি একটি বটবৃক্ষ। আমি থাকলে একটি সবুজ-শ্যামল পৃথিবী বজায় থাকবে। কীট পতঙ্গ ও পশু পাখি আনন্দে বসবাস করবে। আমাকে দেখে তোমাদের শিশুরা 'দান করা' শিখবে যেমন আমি শুদ্ধ বায়ু, শীতল ছায়া, ঔষধ ইত্যাদি দান করে থাকি। কখনো-কখনো তোমাদের শিশুদেরকে নিয়ে আমার ছায়ায় বসবে। আমার জগতের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। ধীরে-ধীরে তারা পাখিদের সাথে কথা বলতে শুরু করবে। তাদের কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে আমাতে বসবাস করা সকল জীব আনন্দে নেচে উঠবে। নিজের সন্তানদের এই আনন্দিত ভাব দেখে আমার বুক ভরে উঠবে। সৃষ্টি জগতে মানবের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই । বৃক্ষ পরিবারে আমিই প্রধান।

আমার দৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রত্যেক জীব সমান। যখন তোমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য নির্দোষ গাছগুলিকে হত্যা কর তখন আমার অত্যন্ত ক্রোধ হয়। আমার পরিবারকে সংহার করে তোমরা কি পেতে চাও? বিলাসবহুল দালান, চমকদার পথ, দ্রুতগতি চলন্ত বাহন, বিলাসিতা ভরা জীবন তোমাদেরকে আনন্দ দেবে? আমার মনে হয় না যে জঙ্গল কেটে, টবের গাছ কেটে তোমরা শান্তি পাবে। হে মানব অনুর্বর ধরার কান্না শোনো। এর উপরের স্তর গরম হচ্ছে। পৃথিবীর উর্বর শক্তি ক্ষীণ হতে চলেছে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বে মারা যাচ্ছে। তার কান্না অবহেলা করো না। আমি বড়ো; আমাকে দিওনা সার, জল ও সুরক্ষা। সকল ঝড়বৃষ্টি একাই সহ্য করব; আমি ধ্বংসাবশেষে পড়ে থাকব, কোনো জনমানবহীন স্থানকে বসতি দেব কিন্তু ঐ বীজের আকাশ কেড়ে নিও না; তাদের পৃথিবী ফিরিয়ে দাও; তাদের বাঁচাও। হে মানব আমাদের কেটো না। আমরা তোমাদের পরিবারেরই সদস্য। আমার এটাই বিশ্বাস যে, আমার প্রিয় মানব আমার ব্যথা অনুভব করবে। ওই অঙ্কুরিত বীজদিগকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে। শুধু সৃজনের জন্য তারা পৃথিবী, আকাশ, জল, আগুন ও বাতাসের ব্যবহার করবে।

• • •

বটগাছের পত্রের মানবের উত্তর

ড.জীতেন্দ্র পাণ্ডেয়

আদরনীয় পিতামনু বট,

প্রণাম,

আপনার পত্র পেয়েছি। পত্র পাঠ করে আমরা মানবজাতি আত্মগ্লানি ও অত্যন্ত দুঃখ

বোধ করছি। সভ্যতার এই যাঁতাকলে আমাদের বুদ্ধিনাশ হয়েছে। ভৌতিক উন্নতি করতে গিয়ে আমরা মানবতা ভুলে গিয়েছি। আমরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ অনুভব করছি। অন্ধবিশ্বাস ও দাম্ভিকতার পথে আমরা চলতে শুরু করেছি। এই ভাবে আমরা আমাদের পায়ে কুঠারাঘাত করছি। আপনার পত্র পড়ে আমাদের জ্ঞান ফিরেছে। সময়ও আমাদের দণ্ড দিয়েছে। কোরোনা কালে আপনার শুন্যতা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা শুদ্ধ বায়ু পাওয়ার জন্য ছটফট করেছি। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কৃত্রিম দামী অক্সিজেন আমাদের দর্প চূর্ণ করেছে। আমরা ওই বৃক্ষের উপর কুঠারাঘাত করেছি যে আমাদের সুরক্ষার জন্য দিবারাত্র লেগে থাকে। মহাশয় আপনি আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন যে সৃষ্টিতে আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। একথা আমরা পূর্ব থেকে জানতাম। শ্রেষ্ঠতার অহংকার আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছে। স্বার্থ আমাদের আত্মকেন্দ্রিক করে দিয়েছে। আমরা শুধু আপনাকে ক্ষতি করি নাই, আমরা নদীকেও দূষিত করেছি, পাহাড় কেটেছি, সমুদ্রকে দূষিত করেছি, হাওয়ায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। জীবনদায়ী ঔষধের জন্য জল জন্তুদেরকেও আমরা ছাড়িনি। আমরা কতটাই অকৃতজ্ঞ।

আমাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়, দণ্ডনীয়। এখনও যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে মাফ করবে না। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি যে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এই ভাবনাকে পুনরায় উজ্জিবিত করব। একমাত্র মানব সেবাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে না; এখন জীবসেবা আমাদের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে। এই সেবা শুধু মানুষের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়, প্রকৃতিকেও সাথে রাখতে হবে। সমবেত প্রচেষ্টায় এই ধরা সুজলম সুফলম এবং স্বর্গময় হয়ে উঠবে। আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য কোনো বৃক্ষের বলি দেবনা। সঞ্চয়ের এই সঙ্কুচিত সিদ্ধান্তকে ছেড়ে ত্যাগের ইচ্ছায় সমস্ত গাছ পালা দেখাশোনা করব।

আমরা এই সংকল্প করি যে, বৃক্ষ রোপন করা ও অন্যদেরকেও প্রেরিত করা আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। হে বৃক্ষ ! আপনার পত্র আমাদেরকে উপকৃত করেছে। সদা সর্বদা আমরা আপনার ইচ্ছানুসারে আচরণ করব। আমাদেরকে মূল স্বভাবে পুনস্থাপিত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মানবজাতি সর্বদা আপনার প্রতি ঋণী থাকবে।

আপনার আত্মীয়

মানব।

(অনুবাদিত)

১৫. পঞ্চ পরমেশ্বর

- মুন্সী প্রেমচন্দ

লেখক পরিচিতি

মুন্সী প্রেমচন্দের জন্ম ৩১ শে জুলাই ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর প্রকৃতনাম ধনপত রায়। মাতা আনন্দিবাই, বাবা আজায়ব রায় শ্রীবাস্তব, স্ত্রীর নাম শিবারাণী দেবী। তিনি ছিলেন আধুনিক হিন্দি এবং উর্দু ভাষার অন্যতম সফল লেখক, ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় লেখকদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগামী লেখক। তাঁর লেখা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ কালজয়ী রচনা হিসাবে বিবেচিত। তাঁর রচনাগুলি হল সেবাসদন, বরদান, কায়াকল্প, গোদান, সপ্তসরোজ, অগ্নিসমাধি, তর্জুবা, রুহানী আদি, মহাজনী সভ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গোদান একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস। ৮ই অক্টোবর ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঠ প্রসঙ্গ

মানুষ সামাজিক প্রাণী। ভালবাসার সম্পর্কে গড়ে উঠা বন্ধুত্বের সম্পর্ক এটা হল মানুষের মানসিক ধর্ম। অন্যদিকে ন্যায়প্রিয়তা ও সততা হল মানব জীবনের অটল সিদ্ধান্ত। সত্যই ভগবান – এই কথাটির সার্থকতা ঘটে এই পাঠের মাধ্যমে। মুন্সী প্রেমচন্দের ‘পঞ্চ পরমেশ্বর’ এই পাঠের অন্তর্গত ‘জুম্মন শেখ’ এবং ‘আলগু চৌধুরীর’ চরিত্র দ্বারা বন্ধুর গভীর ভালবাসাকেও ত্যাগ করে বিচারকের আসনে আসনস্থ হয়ে ন্যায়সংগত বিচারে বিচারকের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং সরপঞ্চের পদে আসনস্থ হয়ে শত্রু-মিত্র, ভালবাসা-ঘৃণা এসবের বিচার লেশমাত্র থাকেনা- এটাই পরিচয় করে দিতে চেয়েছেন।

জুম্মন শেখ ও আলগু চৌধুরীর মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। একে অপরের প্রতি অটুট বিশ্বাস ছিল। তাদের মধ্যে না ছিল কোন খাওয়া-দাওয়ার আচরণ, না ছিল ধর্মের কোন সম্পর্ক, শুধু মাত্র ছিল বিচারের সাম্যতা। বন্ধুত্বের মূলমন্ত্রই হল এটা।

জুম্মন শেখের এক বৃদ্ধা মাসি ছিল। দীর্ঘ প্রতিশ্রুতিতে তার মাসির সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নিল। রেজিস্ট্রির পর জুম্মনের স্ত্রী করিমন খাবারের সঙ্গে-সঙ্গে কিছু ধারালো অপশব্দও বলতে লাগল।

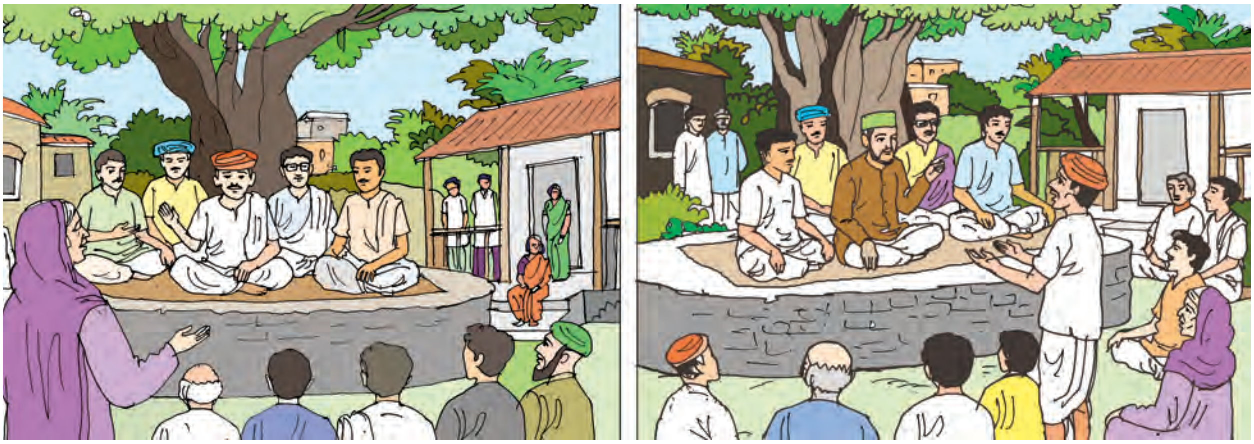

কিছুদিন তার মাসি সহ্য করে নিল, কিন্তু এভাবে একদিন অসহ্য হয়ে সে জুম্মনের কাছে অভিযোগ জানাল। অবশেষে একদিন তার মাসি জুম্মনকে ডেকে বলল, "বাছা! তোমার সাথে আমার দিন যাপন করা সম্ভব হবে না। তুমি আমার খাবারের খরচটা দিয়ে দাও, আমি নিজেরটা নিজেই পাক করে খেয়ে নেব।" জুম্মন এটা স্বীকার করল না।

শেষে তার মাসি রেগে গিয়ে পঞ্চায়েত করার হুমকি দিলেন। এর পর সে বেশ কয়েকদিন ধরে আশে-পাশের গ্রামে ছুটতে থাকে। চতুর্দিক ঘোরাঘুরি করতে - করতে আলগু চৌধুরীর কাছে এসে বললেন, "বাছা, তুমিও সারাদিনের জন্য আমার পঞ্চায়েতে চলে এসো।"

সন্ধ্যাবেলায় একটি গাছের নিচে পঞ্চায়েত বসল। শেখ জুম্মন নিজেও আলগু চৌধুরীর সঙ্গে একটু দূরত্বে বসেছিল। তারপর পঞ্চায়েত আরম্ভ হল।

বিচারকেরা পঞ্চায়েতে আসনস্থ হবার পর বৃদ্ধা মাসি বিচারকের কাছে আবেদন জানাল যে, "আজ দীর্ঘ তিন বছর হয়ে গেল, আমি আমার সব সম্পত্তি আমার ভাগ্নে জুম্মনের নামে লিখে দিয়েছি। তার বিনিময়ে জুম্মন আমাকে ভরণ-পোষণের জন্য খাবার ও বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করে দিতে রাজি হয়েছিল। আমি উদর নির্বাহের জন্য না খাবার পাই, না গায়ের কাপড়। বিচারকদের কাছে আমি এর বিচার চাই। বিচারকদের আদেশ আমি যথা আজ্ঞা পালন করব।

রামধন মিশ্র বলল, "জুম্মন মিঞা তুমি কাকে সরপঞ্চ রাখতে চাও?"

মাসি বলল, "বাছা, পঞ্চ কখনো শত্রু- মিত্র বিচার করেনা। আলগু চৌধুরীর উপর কি ভরসা হয়? তাহলে আমি তাহাকেই সরপঞ্চের জন্য অনুমোদন করছি।"

এই ঝামেলার সঙ্গে আলগুও জুড়তে

চাচ্ছিল না। সে পাশ কাটিয়ে ঘরে যাবার প্রচেষ্টায় ছিল। এমন সময় মাসি গম্ভীর স্বরে বলল, " বিচারকের হৃদয়ে ভগবান বাস করে। বিচারকের মুখ থেকে যা বের হয়, তা ভগবানেরই উক্তি।"

আলগু চৌধুরী সরপঞ্চ হল। আলগু চৌধুরী বললেন, "শেখ জুম্মন! তুমি এবং বৃদ্ধা মাসি উভয়েই আমাদের নজরে সমান। তোমার যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বল।"

জুম্মনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে এখন বাজি আমার। অতএব শান্তচিত্ত হয়ে বলল, "তিন বছর গত হল মাসি তার সম্পত্তিকে আমার নামে করে দিল। আজও পর্যন্ত মাসিকে কোন কষ্ট দেইনি। কিন্তু পরিবারে একটু ঝামেলা থাকেই। মাসি আমার কাছে আলাদা করে মাসিক খরচ চাইছে। কতখানি সম্পত্তি তা সকলেরই জানা আছে, এর থেকে এমন কোন আয় হয়না যে, মাসিকে আলাদা করে খরচ দিতে পারবো।"

আলগু চৌধুরী ন্যায়প্রিয় মানুষ ছিল। সে জুম্মনকে জেরা করতে লাগল। এক-একটি প্রশ্ন জুম্মনের হৃদয়ে আঘাত করতে লাগল। আলগু শেষ সিদ্ধান্ত শুনালেন, "জুম্মন শেখ ! বিচারকেরা মামলাটি নিয়ে বিবেচনা করেছে। তারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে এটা বুঝতে পেরেছে যে, মাসির সম্পত্তি থেকে এতটকু আয় অবশ্যই হয় যার কিছু অংশ মাসিকে মাসিক খরচ হিসেবে দেওয়া যায়। ব্যাস! এটাই আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত !" এই সিদ্ধান্ত শুনে জুম্মন অবাক হয়ে গেল। যে আমার বন্ধু, সে আজ শত্রুর ন্যায় ব্যাবহার করল।

কিন্তু রামধন মিশ্র এবং অন্য বিচারকেরা আলগু চৌধুরীর এই নীতি পরায়ণতার খোলা মনে প্রশংসা করছিল।

এই সিদ্ধান্ত আলগু এবং জুম্মনের বন্ধুত্বের আধারকে নাড়িয়ে দেয়। এত পুরানো বন্ধুত্বের বৃক্ষ সত্যের একটি আঘাতও সহ্য করতে পারেনি।

গত বছর আলগু চৌধুরী বটেশ্বর থেকে খুব সুন্দর এক জোড়া ষাঁড় কিনে নিয়ে এসেছিলেন। পঞ্চায়েতের এক মাস পর এই জোড়ার একটি ষাঁড় মারা যায়। তার জোড়া অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। তারপর যুক্তি করল যে একে বেচে দেওয়াই ঠিক।

গ্রামে সমঝু নামে এক মহাজন ছিল, সে গ্রাম থেকে গুড়, ঘি বোঝাই করে বাজারে নিয়ে যেত, বাজার থেকে তেল, লবণ বোঝাই করে গ্রামে আনত এবং বিক্রী করত। সে ভাবল, এই ষাঁড়টাকে যদি পাওয়া যায় তাহলে দিনে তিনটি চালান হবে। এক মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিল।

একদিন সমঝু মহাজন চতুর্থ চালানে দ্বিগুন বোঝা বোঝাই করল। পশুটি সারাদিনের ক্লান্ত, কিন্তু মহাজন চাবুক দিয়ে

আঘাত করতে লাগল। ষাঁড়টি সম্পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে দিল। কিছুদূর দৌড়াল কিন্তু শক্তিও তাহার জবাব দিয়ে দিল। ষাঁড়টি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মহাজন ষাঁড়টিকে অনেক আঘাত করল, কিন্তু মৃতক কি কখনো উঠতে পারে ?

এই ঘটনার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। আলগু তার ষাঁড়ের দাম চাইলেই মহাজন এবং তার স্ত্রী, উভয়েই বকুনি দেয়। একদিন আলগুও রেগে গেল। শব্দ শুনে গ্রামের লোকের ভীড় জমা হল। সকলে পরামর্শ দিতে লাগল যে পঞ্চায়েত করে নাও।

পঞ্চায়েতে যা সিদ্ধান্ত হয়, তা স্বীকার করে নাও। এভাবে উভয়ই পঞ্চায়েত করার জন্য রাজী হল।

এরপর তৃতীয় দিন সেই গাছের নীচে পঞ্চায়েত বসল। রামধন মিশ্র বলল, ‘‘এখন বিলম্ব না করে সরপঞ্চের নির্বাচন করা হোক।’’

সমঝু মহাজন দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলল, ‘‘আমার তরফ থেকে জুম্মন শেখ।’’

সরপঞ্চের পদে আসনস্থ হতে - না হতেই জুম্মন শেখের দায়িত্বের বিবেক জেগে উঠল। সে ভাবল, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া আমার জন্য এক চুলও ঠিক নয়!

বিচারকেরা উভয় পক্ষকেই জেরা করতে লাগল। একটি ব্যাপারে সকলেরই একমত যে সমঝুকে ষাঁড়ের দাম দিতেই হবে। এ ছাড়া কিছু সদস্য সমঝু মহাজনকে শাস্তি দিতে চাইলেন, যাতে পশুদের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা করার সাহস কেউ না পায়। শেষ পর্যন্ত জুম্মন শেখ নিজের সিদ্ধান্ত শোনালেন, ‘‘আলগু চৌধুরী এবং সমঝু মহাজন! বিচারকেরা তোমাদের মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেছেন। সমঝুকে ষাঁড়ের পুরো দাম দিতে হবে। ষাঁড়টির মৃত্যু হয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণেই যে ষাঁড়টিকে খুব কঠিন পরিশ্রম করানো হয়েছিল।

সমঝু মহাজন বললেন, ‘‘আমার প্রতি যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এতে কিছুটা ছাড় দেওয়া উচিৎ।’’

জুম্মন বলল, ‘‘এটা আলগু চৌধুরীর উপরই নির্ভর করে। সে যদি ছাড় দেয়, তাহলে এটা তার সজ্জনতা।’’ এর সঙ্গে-সঙ্গেই চতুর্দিক হতে প্রতিধ্বনি হল, ‘পঞ্চ কী জয়।’

কিছুক্ষণ পর জুম্মন আলগু চৌধুরীর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘‘ভাই তুমি যখন থেকে আমার মামলার পঞ্চায়েত করেছ, তখন থেকেই আমি তোমার মারাত্মক শত্রু হয়ে গেছি। কিন্তু সরপঞ্চের পদে বসে আজ আমি জানলাম, না কেউ বন্ধু থাকে, না কেউ শত্রু। ন্যায় ছাড়া অন্য কিছুই সে দেখতে পায়না।’’ আলগু কাঁদতে লাগল। এদের অশ্রুতে দুটি হৃদয়ের মলিনতা ধুয়ে গেল। বন্ধুত্বের ঝলসে যাওয়া লতা পুনঃরায় সবুজ হয়ে উঠল।

(অনুবাদিত)

শব্দার্থ

সাম্যতা = সমান, সম | **অভিযোগ** = নালিশ | **হুমকি** = ভয় দেখানো

নির্বাহ = চালান, অতিবাহিত, প্রতিপালন | **অনুমোদন** = সমর্থন

উক্তি = বাক্য | **জেরা** = প্রশ্ন করা | **প্রশংসা** = স্তুতি

প্রতিশ্রুতি = প্রতিজ্ঞা | **পুঙ্খানুপুঙ্খ** = সূক্ষ্ম বিবেচনা | **পরামর্শ** = যুক্তি

ন্যায়সঙ্গত = উচিৎ, যথাযথ

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক) .... ← জুম্মন সম্পত্তির বিনিময়ে যা যা দেবে। → ....

খ) .... ← মহাজন বাজারে বোঝাই করে নিয়ে যেত। → ....

২) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

আলগু চৌধুরী খুব সুন্দর এক জোড়া ষাঁড় কিনে আনল।
↓
....
↓
....
↓
....
↓
....

৩) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) জুম্মন শেখ ও আলগু চৌধুরীর মধ্যে বিচারের সাম্যতা ছিল না। -....................................

খ) জুম্মন শেখের এক বৃদ্ধা মাসি ছিল। -....................................

গ) আলগু চৌধুরী ন্যায়প্রিয় মানুষ ছিল। -....................................

ঘ) রামধন মিশ্র জুম্মন শেখের পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ ছিল। -....................................

৪) **নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) অসহ্য ✕...................... খ) শেষ ✕......................

গ) নিন্দা ✕...................... ঘ) অবিশ্বাস ✕......................

৫) **শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) জোগাড় -...................... খ) পরিবর্তে -......................

গ) দৃষ্টি -...................... ঘ) বলদ -......................

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) বন্ধুত্বের মূলমন্ত্র কী?

খ) জুম্মন শেখ কার সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছিল ?

গ) আলগু চৌধুরী কেমন প্রকৃতির লোক ছিল?

ঘ) সমঝু মহাজন সরপঞ্চ পদের জন্য কাকে অনুমোদন করল?

৮) **সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

ক) জুম্মনের মাসি জুম্মনকে কী অভিযোগ জানাল?

খ) আলগু চৌধুরী ষাঁড়টি মহাজনের কাছে কেন বিক্রী করল ?

গ) বিচারকেরা সমঝু মহাজনকে কেন শাস্তি দিতে চেয়েছিল?

৯) **কে, কাকে বলেছে লেখো।**

ক) “বাছা, তুমিও সারাদিনের জন্য আমার পঞ্চয়েতে চলে এসো।”

খ) “শেখ জুম্মন ! তুমি এবং বৃদ্ধা মাসি উভয়েই আমাদের নজরে সমান।”

গ) “ব্যস ! এটাই আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত।”

ঘ) “এটা আলগু চৌধুরীর উপরই নির্ভর করে।”

১০) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

“বন্ধুত্বের চাইতে ন্যায়প্রিয়তাই শ্রেষ্ঠ।”– এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

● সর্বদা মনে রেখো। ●

“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।”

● **আমি বুঝেছি :**..

....

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

ক) সিদ্ধান্ত -...................... খ) নির্ভর -......................

● **উপযোজিত লেখন :**

“সত্যেরই জয় হয়” – এ ধরনের জানা যে কোন ন্যায়প্রিয় কাহিনী লেখো।

১৬. সিদ্ধার্থের দয়া

- নবীনচন্দ্র সেন

কবি পরিচিতি

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। ১৮৬৮ সালে বি.এ.পাস করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। নবীনচন্দ্র নতুন যুগের মহাকবিগণের অন্যতম। তাঁর কবিতার ভাব ও ভাবুকতার একটি গভীর ও উন্নত আদর্শরক্ষার প্রয়াস আছে। তাঁর কল্পনাশক্তি, বিশেষতঃ গল্প-রচনার শক্তি-কিছু অবাধ ও স্বাধীন ছিল। ভাবে উচ্ছাসেও একটা বাড়াবাড়ি ছিল। তবুও তাঁর ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ছন্দও মধুর গম্ভীর। একজন মহাপণ্ডিত তাঁর- 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্রে', 'প্রভাস' - এই তিনখানি কাব্যকে উনবিংশ শতাব্দীর 'মহাভারত' নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কবির দেহান্তর ঘটে।

কবিতা প্রসঙ্গ

সিদ্ধার্থ এবং দেবদত্ত ছিলেন শাক্য বংশের দুই রাজপুত্র। একদিন সিদ্ধার্থ নির্জনে একাকী বসে ভাবছেন, এমন সময় এক তীরবিদ্ধ রাজহাঁস তাঁর কোলে এসে পড়ল। সিদ্ধার্থ বেদনায় অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর করুণার স্পর্শে আহত রাজহাঁস প্রাণ ফিরে পেল। এমন সময় দেবদত্ত এসে সেই রাজহাঁসের দাবি করল। সিদ্ধার্থ তাঁর রাজ্যের বিনিময়েও দেবদত্তকে সেই হাঁসটি দিতে নারাজ। এদৃশ্য দেখে দেবদত্ত হতবাক হয়ে গেলেন। সিদ্ধার্থের চোখে-মুখে তিনি দেখতে পেলেন করুণার প্রতিমূর্তি। সেই দিন থেকে পাখিরাও যেন করুণার বাণী শোনাতে লাগল।

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি অন্যমন,
শুক্ল মেঘখণ্ড-মতো রাজহংস শতশত
আনন্দলহরি পূর্ণ করিয়া গগন।
যাইছে ভাসিয়া সুখে হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।

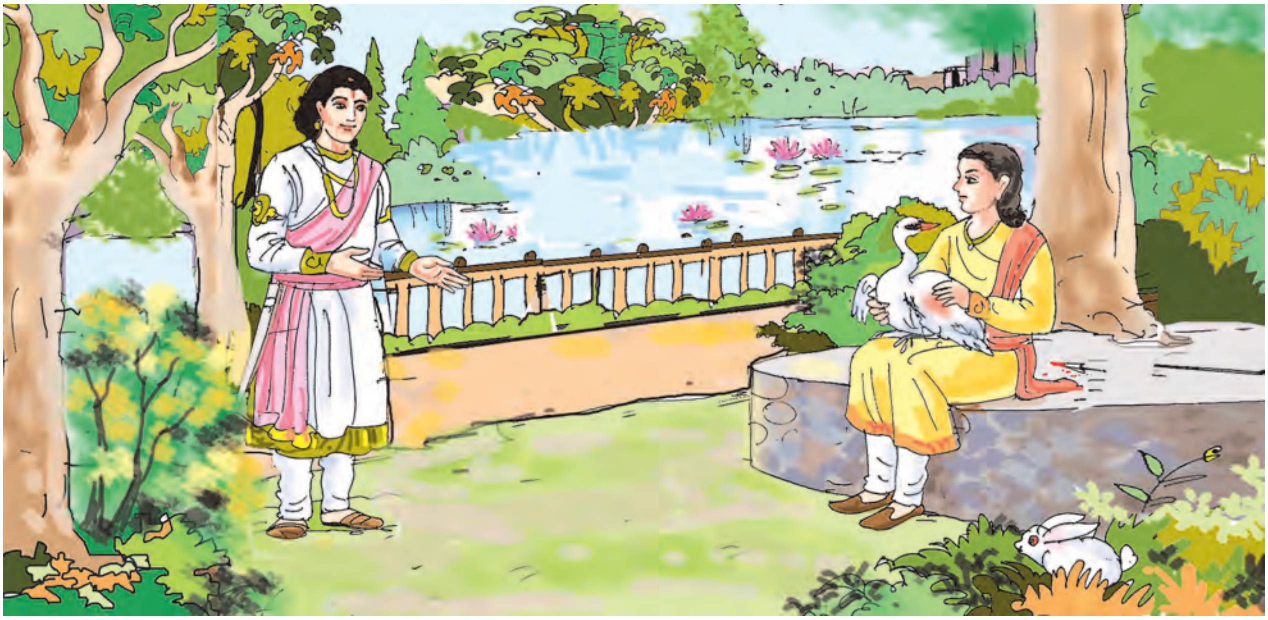

করুণার অশ্রুজলে		করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল,
কুমার লইয়া বুকে		মুগ্ধা জননীর মতো
চাহি ক্ষুদ্র মুখ পানে রহে কিছুকাল।
কী মহিমা করুণার		কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা কী মধুর করে প্রতিদান?
উভয়ে উভয় -পানে		নীরবে চাহিয়া কিবা
করুণার উভয়ের বিমোহিত প্রাণ!
আসি দেবদত্ত কহে		''কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হয়ে হত পড়েছে ভূতলে!''
কুমার কহিলা ধীরে -	''হত জীব, হত্যাকারী
পায় যদি ভাই, কোন্ ধর্মশাস্ত্র বলে,-
যে দেয় জীবন তারে	সে কি তাকে পাইবে না?
হত নহে এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই।	আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।

তোমার তো আছে প্রাণ, পাখিটির ক্ষুদ্র-প্রাণে,
বুঝ না কি যে ব্যথা পেয়েছে ভীষণ ?
লও তুমি শাক্যরাজ্য আমি নাহি চাহি তাহা
এ হংস আমার আমি দিব না কখন।”
শাক্যপুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত বিস্মিতচিত্ত,
দেখিল কুমার নহে- মূর্তি করুণার।
ফিরিল নীরবে গৃহে উড়িল মরাল সুখে
কলকন্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

শব্দার্থ

মনোহর = অতি সুন্দর
শুক্ল = সাদা
প্রস্রবণ = নির্ঝর
পরশন = স্পর্শ
গগন = আকাশ
মরাল = রাজহংস
বিহঙ্গ = পাখি
শর = তীর
বিকল = বিহ্বল
স্তম্ভিত = বিস্মিত

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) অপূর্ণ পংক্তি পূর্ণ করো।

ক) একদিন নিরজনে ....। খ) কুমার লইয়া বুকে ....।
গ) আসি দেবদত্ত কহে ....। ঘ) ফিরিল নীরবে গৃহে ....।

২) ঘটনা অনুসারে সাজিয়ে লেখো।

ক) রাজহাঁস সিদ্ধার্থের সেবায় সুস্থ হয়।
খ) সিদ্ধার্থ সমগ্র রাজ্যের বিনিময়েও রাজহাঁসটি দিতে রাজি হয়নি।
গ) রাজহাঁস আহত হয়।
ঘ) দেবদত্ত রাজ হাঁসের উপর তার প্রভুত্ব দেখান।

৩) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) কৃষ্ণ ×...................... খ) পাপ ×......................
গ) বৃহৎ ×...................... ঘ) মরন ×......................

৪) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) .... খ) ....

গ) .... ঘ) ....

ঙ) .... চ) ....

৫) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক-এক বাক্যে দাও।

ক) পুরোদ্যানে কে বসেছিল?

খ) রাজহংসের গায়ের রং কেমন ছিল?

গ) কার তীরে রাজহাঁসটি আহত হয়েছিল?

৬) ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

"ত্রাণকর্তা হত্যাকারীর চেয়ে বড়।" – এ বক্তব্য সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৭) নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।

ক) কবিতার নাম -.................................

খ) কবির নাম -.................................

গ) তোমার পছন্দমত দুটি পংক্তি -.................................

ঘ) পংক্তি দুটি পছন্দ হওয়ার কারণ -.................................

ঙ) কবিতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা -.................................

● সর্বদা মনে রেখো। ●

"জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

● ভাষাবিন্দু :

ক) কবিতায় যে সব বিশেষ্য পদ আছে তা প্রকার অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করো।

নামবাচক	জাতিবাচক	বস্তুবাচক	সমষ্টিবাচক	ভাববাচক	গুণবাচক
ক) সিদ্ধার্থ					
খ)					শুক্ল
গ)	রাজহাঁস				
ঘ)		শর			
ঙ)				বিকল	

১৭. চিন্তাশীল

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ই মে ১৮৬১ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদাদেবী। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'কথা ও কাহিনী', 'সহজপাঠ', 'রাজর্ষী', 'ছেলেবেলা', 'শিশু ভোলানাথ', 'হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলী song offerings' এর জন্যে তিনি প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। 'চিন্তাশীল' নাটিকাটি তাঁর 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। ৭ই আগস্ট ১৯৪১ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীল নাটিকাটি একটি লোকপ্রিয় কৌতুক নাটিকা। এক অলস মানুষের কাহিনী চিন্তাশীল। নাটিকাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র নরহরি। তার মূল কাজ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবা। বিশেষতঃ শব্দের যথাযথ প্রয়োগ হল কিনা, কোন শব্দ কীভাবে পরিবর্তিত হল ইত্যাদি বিবেচনা করা। এছাড়াও অযথা কিছু খুঁটিনাটি নিয়েও তার ভাবনা ব্যক্ত হয়। আদরের ভাগনেকে আদর করার সময় তাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হয়। সমগ্র নাটকে ভাবনা ব্যতীত কোন কাজই আমরা দেখতে পাই না।

প্রথম দৃশ্য

(চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন)

মা - অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি - আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা - কী জানি বাপু!

নরহরি - 'বৎস' ! আজ তুমি বলছ 'বাছা'—দু-হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস' -

এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না!

(পুনরায় চিন্তায় নিমগ্ন)

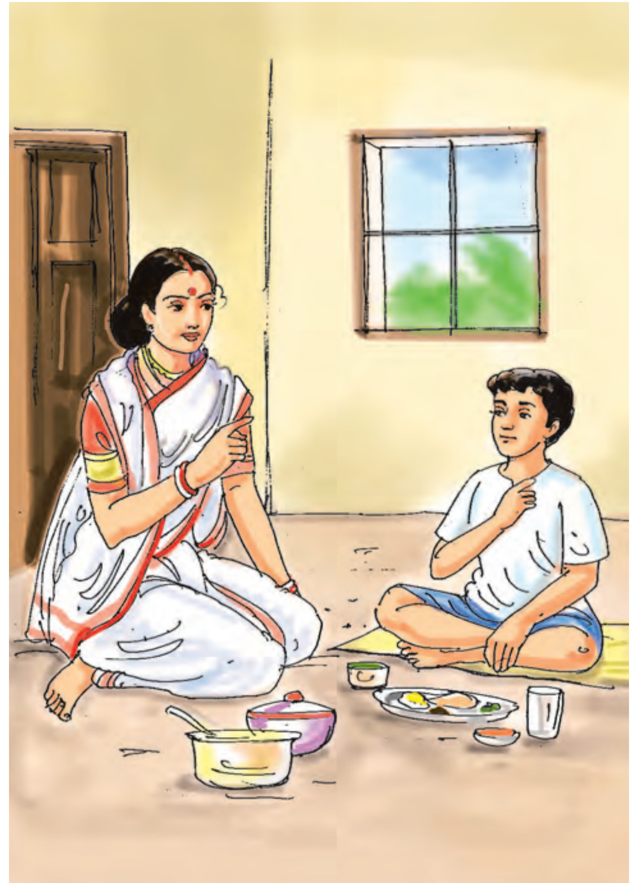

মা - যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার একবার ওঠ।

নরহরি - (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীল স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়। ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

(ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব)

মা - আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো ভাবিস, তুইই বল দেখি উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি - এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে, ভেবে পরে বলব।

মা - আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

(প্রস্থান)

(মাসিমা প্রবেশ)

মাসিমা - ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি- সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি - কুরুক্ষেত্র ! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র ! মনে পড়লে কি শরীর লোমাঞ্চিত হয় না! অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না! আহা, কত কথা মনে পড়ে ! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বলো কী মাসি ! হেসেই কুরুক্ষেত্র ! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র!

(অশ্রুনিপাত)

মাসিমা - ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু!

(প্রস্থান)

(দিদিমা প্রবেশ)

দিদিমা - ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায় !

নরহরি - ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উল্টে যায়। রোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (চারি দিকে চাহিয়া) একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা - এই তোমার মাথা আছে- মুণ্ডু আছে।

নরহরি - কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা - তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে। নাও আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন ভন করছে।

নরহরি - ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উলটো কথা বললে। মাছি তো ভন ভন করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

দিদিমা - কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশ্যে)

(নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ)

মা - (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি - ছি-মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ-অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না- দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ডবৎ মানে-

মা - না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি - আদর করব? আচ্ছা, এসো আদর করি। (শিশুকে কোলে লইয়া) কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো, একটু ভাবি।

(চিন্তামগ্ন)

মা - আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি - ভাবতে হবে না মা? বল কী! ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জানো? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায়- তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি মা!

মা - থাক বাবা, সে কথা আর-একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্নেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি - ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?

হরিদাস - আমি চমা কাব।

মা - দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি - না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা - (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

(নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন)

(কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে আমি কাশীবাসী হব।

নরহরি - তা যাও-না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না!

মা - (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হলো না। (প্রকাশ্যে) তা হলে তো আমাকে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি - সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছুদিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা - (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না- আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

(সমাপ্ত)

শব্দার্থ

ব্যামো = অসুখ
দণ্ডবৎ = প্রণাম
সুশীলা = গুণবতী
চিন্তাশীল = ভাবুক
রোসো = অপেক্ষা করো
কালক্রমে = সময়ের সাথে-সাথে
বন্দোবস্ত = ব্যবস্থা, জোগাড়
ভাগিনেয় = ভাগ্নে, বোনের ছেলে
লোমাঞ্চিত = শিহরিত, রোমাঞ্চিত

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

এক কালে লক্ষ্মী বলতে যাদের বোঝাত

২) শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

ক) অত ভেবো না, মাথায় .... হবে বাছা!

খ) ও নরু সূর্য যে .... যায়।

গ) কাজ নেই তোমার .... করে।

ঘ) জাদু, তোমার মামাকে .... করো।

৩) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) কুরুক্ষেত্র ! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র ! -......................

খ) আমাদের কথা শুনলেই তার আনন্দ উপস্থিত হয়। -......................

গ) ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। -......................

ঘ) তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু রাগ করি। -......................

৪) কারণ লেখো।

ক) মাসিমা নরুকে পাগল বললেন।

খ) পাড়া শুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে।

গ) "লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ।" - কথাটি শুনিয়া নরহরি চমকিয়া উঠিল।

৫) পাঠ থেকে শব্দার্থ বেছে লেখো।

ক) অসুখ -....................... খ) গুণবতী -.......................

গ) প্রণাম -....................... ঘ) ভাবুক -.......................

৬) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।

ক) মিথ্যা ×....................... খ) অনুপস্থিত ×.......................

গ) পুরুষ ×....................... ঘ) অনাদর ×.......................

৭) নীচের শব্দগুলির লিঙ্গান্তর করো।

ক) দেবতা -....................... খ) দাদু -.......................

গ) বাবা -....................... ঘ) মেসো -.......................

ঙ) মামী -.......................

৮) পদ পরিবর্তন করো।

ক) আদর -....................... খ) শোক -.......................

গ) .... - ভেতো ঘ) .... - প্রামাণ্য

ঙ) নির্ভর -....................... চ) .... - আমুদে

৮) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) নরহরির প্রধান স্বভাব কী ছিল ?

খ) কালক্রমে লক্ষ্মী শব্দ কাদের জন্য প্রয়োগ হচ্ছে ?

গ) নরহরির ভাগ্নের নাম কি ?

ঘ) মা কোথায় যেতে চেয়েছিলেন ?

১০) **সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

ক) ভাষার পরিবর্তন বিষয়ে নরহরি মা'কে কী বললেন ?

খ) মাছি ভন ভন করে না, - সে কথা নরহরি কীভাবে বোঝাল ?

গ) মায়ের কাশী যাবার কথা নিয়ে নরহরিকে কতদিন ভাবতে হবে এবং কেন ?

১১) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'অধিক চিন্তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

● **সর্বদা মনে রেখো।** ●

'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।'

● **আমি বুঝেছি :**...

....

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

ক) অশ্রুনিপাত -........................

খ) আচ্ছন্ন -........................

গ) চিন্তাশীল -........................

খ) বাক্য সংকোচন করো - সব সময় চিন্তায় মগ্ন থাকে যে।

● **উপযোজিত লেখন :**

তোমার ছোটভাই পরীক্ষায় বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারেনি, সে খুব চিন্তিত। তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি পত্র লেখো।

১৮. খোলা মাঠের মানুষটি

- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

লেখক পরিচিতি

শঙ্করীপ্রসাদ বসু : ২১শে অক্টোবর ১৯২৮ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনাথ বসু মাতা মনোরমা দেবী। তিনি একজন বিশিষ্ট বাঙালি লেখক, সমালোচক ও গবেষক। তিনি রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ গবেষক হিসাবে প্রসিদ্ধ। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থেকে লেখক-চিন্তাবিদ হিসাবে নিজস্বতার ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর রচিত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', 'সহাস্য বিবেকানন্দ' ও 'বন্ধু বিবেকানন্দ' তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাত খণ্ডে প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' এর জন্য ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ৬ই জুলাই ২০১৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠটি লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা 'সহাস্য বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় মি.লেগেট নামে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই পাঠে লেখক বলেছেন যে যদি আমরা আমাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে জানি এবং তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি তবে অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়।

স্বামীজী তখন আমেরিকায় মি. লেগেটের বাড়ীতে আছেন। লেগেট ধনী ব্যক্তি। তাঁর নিজস্ব একটি গলফ্—কোর্স আছে। মাঝারি আকারের নয় গর্তের কোর্স, পরিপাটি সুন্দর। লেগেটের আমন্ত্রণে অনেক বড়-বড় খেলোয়াড় সেখানে খেলে যান।

স্বামীজী একদিন গলফ্-মাঠটিতে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে আছে মিসেস লেগেটের বালক পুত্র হলিস্টার। স্বামীজী বেড়াতে-বেড়াতে হলিস্টারকে ডেকে বললেন — আচ্ছা, ওখানে পত্‌পত্‌ করছে — ওটা কি? ঐ যে পোঁতা আছে?

হল সুযোগ পেয়ে গেল। স্বামীজীকে এবার জ্ঞানদান করা যাবে। গলফ্ খেলা ব্যাপারটি কি, যৎপরোনাস্তি বোঝাল। মোটমাট জানা গেল, ক্লাব অর্থাৎ গল্‌ফের লাঠি দিয়ে মেরে বলকে গর্তে ফেলতে হয়। গর্তে বল পড়লে পয়েন্ট লাভ। গর্তের কাছে একটা পতাকা পোঁতা থাকে।

হল উৎসাহে ছুটে গিয়ে একটা ক্লাব জোগাড় করে এনে আরও জ্ঞানদান করতে লাগল।

স্বামীজী ক্লাবটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- কত মারে গর্তে বল পড়তে পারে তোমার মনে হয়?

হল - সাত আট বার তো লাগে।

স্বামীজী - মাস্টার হল, আমি কিন্তু এক মারে গর্তে বল ফেলতে পারি।

হল - এক মারে? হুঁ, এক মারে! বললেই হল?

স্বামীজী - বাজি ধরবে ? আমি এক মারেই ফেলব।

হল - হি হি হি। হুঁ, উনি আনাড়ি, উনি এক মারে পারবেন! তাহলেই হয়েছে।

স্বামীজী - অত কথা কি বাপু - বাজি রাখো ! পকেটে কত আছে?

হল - এক্‌খুনি। (শ্রীমান হলের বিশেষ সম্পদ একটি হাফ ডলার, সেটি পকেটে থেকে বের ক'রে-) এই বাজি রাখলাম।

স্বামীজী - (স্বামীজী পকেট থেকে এক ডলার বের করে বললেন) আমার এই বাজি। এই সময়ে মি. লেগেটের অকুস্থলে প্রবেশ। দুজনকে পরামর্শ করতে দেখে তিনি হেসে এগিয়ে এলেন।)

মি.লেগেট - কি ব্যাপার ?

স্বামীজী - ব্যাপার আমার ও হলের মধ্যে।

মি.লেগেট - প্রাচ্য ঋষি ও আমেরিকান বালকের মধ্যে কোন্ গুরুতর ব্যাপার ঘটছে জানতে পারি কি?

স্বামীজী - (সহাস্যে) – আমি হলের কাছ থেকে হাফ ডলার হরণ করার ইচ্ছা করেছি।

হল - (লাফ মেরে, তালি দিয়ে) স্বামীজী হেরে যাবেন ! স্বামীজী হেরে যাবেন।

মি.লেগেট - (সবিস্ময়ে) তার মানে বাজি। বাজিটা কী নিয়ে ?

স্বামীজী - জানতে গেলে আপনাকেও বাজির পয়সা বের করতে হবে। আমি হলকে বলেছি, এক মারে ঐ গর্তে বলটা ফেলব !

মি.লেগেট - অসম্ভব স্বামীজী অসম্ভব। খুব পাকা খেলোয়াড়দের এখানে আমি নেমতন্ন করে আনি। তারাও চার মারের কমে ওকাজ পারেনা। আপনি চাইছেন এক মারে ফেলতে ! হিপ্নটিজম, মেসমেরিজমের খেলা নাকি ?

স্বামীজী - (হেসে) অতকথার দরকার কি, আপনার বাজি কত বলুন ?

মি.লেগেট - (মানিব্যাগ বার করে) এই দশ ডলার, আমার বাজি।

স্বামীজী - বাহবা ! আপনার দশ ডলার আর হলের হাফ ডলার– আমারই হচ্ছে –

মি.লেগেট - দেখা যাক।

স্বামীজী এবার একটি ক্লাব হাতে নিয়ে স্থির চোখে খানিকক্ষণ পতাকাটির দিকে তাকালেন। তার পর বললেন - হল তুমি গর্তটার কাছে গিয়ে দাড়াও। আমি যখন বলব তখন তুমি গর্তটা দেখিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে যাবে। আমার বল শূন্য পথে ওখানে গিয়ে পড়বে। মি.লেগেট খুব আমোদের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

হল গর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্বামীজী কোটের হাতা গুটিয়ে নিলেন। এক দৃষ্টে গর্তের দিকে তাকালেন- গলফ্‌ক্লাব দোলালেন কয়েকবার– (হলকে বললেন) এবার ঠিক দেখিয়ে দাও গর্তটা কোথায় – হল গর্তটা দেখাল।

- স্বামীজী বললেন সরে যাও। হল সরে গেল। তারপর – স্বামীজী আবার ক্লাবটি দোলালেন – বলে আঘাত করলেন – বলটি তীব্র বেগে অর্ধচন্দ্রাকারে শূন্য দিয়ে ছুটে চলল – এবং ঠিক গর্তে গিয়ে পড়ল !!!

হায় হায় করে উঠল হল। হাউ মাউ করে বলল –

আমার হাফ ডলার ! আমার হাফ ডলার !

(হতভম্ব মি.লেগেট বিড় বিড় করে বললেন)

ভারতীয় যোগীর অলৌকিক খেলা।

স্বামীজী - (হেসে বললেন) আরে না না । যৌগিক শক্তি এসব তুচ্ছ ব্যাপারে খরচ করি না। কি করেছি দু'কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি চোখ দিয়ে দূরত্বটা মেপে নিলাম! আমার হাতের পেশীর শক্তি কতখানি, তা সঠিক আমার জানা আছে। এখন মনকে বললাম, ঐ সাড়ে দশ ডলার সম্পদটি আমার চাই । আমার ইচ্ছা মন থেকে পেশীতে গেল- হাত চালালাম – এবং যা চাইছিলাম পেয়ে গেলাম।

অপূর্ব মানুষ তাঁর মজাও থামে না, হাসিও থামে না।

শব্দার্থ

নিজস্ব = নিজের	**নেমতন্ন** = নিমন্ত্রণ	**জোগাড়** = সংগ্রহ
তুচ্ছ = হেয়	**বাজি** = খেলার পণ	**শক্তি** = ক্ষমতা
তীব্র = প্রখর	**সম্পদ** = ধন, সম্পত্তি	**পুত্র** = ছেলে

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

স্বামীজী যাদের সাথে বাজি ধরেছিলেন।
→ ....
→ ....

২) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

হল সরে গেল।
↓
....
↓
....
↓
....
↓
....

৩) **সত্য / মিথ্যা লেখো।**

ক) হুল সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। -............................

খ) আমার ইচ্ছা মন থেকে পেশীতে গেল না। -............................

৩) **নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) অনিচ্ছা ×...................... খ) দুর্যোগ ×......................

গ) লৌকিক ×...................... ঘ) কুৎসিত ×......................

৪) **পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ লেখো।**

ক) প্রয়োজন -...................... খ) ব্যয় -......................

গ) আনন্দ -...................... ঘ) নিকট -......................

৫) **কারণ লেখো।**

ক) হলিস্টার হায় হায় করে উঠল...

খ) অনেক বড় বড় খেলোয়াড় খেলতে আসেন...

৬) **এক বাক্যে উত্তর দাও।**

ক) হলিস্টার কে ছিল?

খ) মি.লেগেট কত ডলার বাজি ধরেছিলেন?

গ) স্বামীজী বলটা কতবার চেষ্টা করে গর্তে ফেলেছিলেন?

ঘ) হলিস্টার কত ডলার হেরেছিল?

ঙ) মি. লেগেটের গলফ্ কোর্সটি কেমন ছিল?

৭) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) হলিস্টার স্বামীজীকে গলফ্ খেলা সম্পর্কে কী বুঝিয়েছিল?

খ) স্বামীজী কেমন ভাবে বলটি ঠিক গর্তে ফেলেছিলেন ?

গ) 'স্বামীজী হেরে যাবেন' একথা হলিস্টার কেন বলেছিল?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

'কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজন' - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

● **সর্বদা মনে রেখো।** ●

"ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।"

● **আমি বুঝেছি :**...

....

● ভাষাবিন্দু :

বাক্য সংকোচন : বাক্য সংকোচন হলো কোনো বাক্য বা বাক্যাংশকে একপদীকরণ বা একশব্দে প্রকাশ করা। বাক্য সংকোচনের অর্থ বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা বা ছোট করা।

ক) নিম্নলিখিত বাক্য সংকোচনগুলি অধ্যয়ন করো।

১. জানা আছে যা।	- জ্ঞাত
২. একই গুরুর শিষ্য।	- সতীর্থ
৩. যার আকার নেই।	- নিরাকার
৪. যিনি শিক্ষা দান করেন।	- শিক্ষক / শিক্ষিকা
৫. সাধনা করেন যিনি।	- সাধক / সাধিকা

● উপযোজিত লেখন :

তোমার বিদ্যালয়ে 'স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির সাহায্যে বৃত্তান্ত লেখো।

ক) অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (দিন তারিখ সময়)
খ) নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ
গ) স্বামীজীর প্রতিমায় মাল্যদান সহ পূজা অর্চনা
ঘ) প্রস্তাবনা
ঙ) প্রধান অতিথি এবং অন্য সকলের ভাষণ
চ) সভাধ্যক্ষের ভাষণ
ছ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন

১৯. অচল হলে চলবে না

- অতুলপ্রসাদ সেন

কবি পরিচিতি

অতুলপ্রসাদ সেন বাংলাদেশে ঢাকায় ২০ই অক্টোবর ১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম রামপ্রসাদ সেন এবং মায়ের নাম হেমন্তশশী। অতুল প্রসাদ সেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন বিশিষ্ট বাঙালি গীতকার, সুরকার ও গায়ক। তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদও ছিলেন। তাঁর রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম। ভক্তি ও প্রেম তার জীবনের দুঃখ যন্ত্রণাগুলি গানের ভাষায় বাঙ্ময় মূর্তি ধারন করেছিল। বেদনা অতুল প্রসাদের গানের প্রধান অবলম্বন। ২৬শে আগষ্ট ১৯৩৪ সালে এই মহামানব ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

অতুল প্রসাদ সেন এই কবিতায় নিজের জীবনের কর্তব্য, কর্ম, দেশের প্রতি বিশিষ্ট্য কাজ, জীবনের সাথে জড়িত কর্ম করার জন্য প্রেরিত করেছেন। জলের স্রোতের মত জীবন, নিজেকে তরীর সাথে তুলনা করে কর্মকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতিগানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না।।
হল যদি তোর না হয় সচল,
বিফল হবে জলদ-জল;
ঊষর ভূমে সোনার ফসল
ফলবে না রে ফলবে না।।

সবাই আগে যায় রে চ'লে;
ব'সে আছিস তুই কী বলে?
এখন নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে
তরী তোর চলবে না রে চলবে না।
তীরের বাঁধন দে রে খুলি,
ভেসে যা তুই পালটি তুলি;
দিক যদি তুই না যাস ভুলি।
বিধি তোরে ছলবে না রে ছলবে না।

শব্দার্থ

অলস = আলসে, নিরুদ্যম, কুঁড়ে
তরী = নৌকা
বিফল = বৃথা, নিষ্ফল
আসন = বসবার জায়গা
স্তুতি = প্রশংসা
ঊষর = অনুর্বর
স্রোত = জলপ্রবাহ
তীর = তট, কূল

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

হল যদি তোর না হয় সচল।
↓
...
↓
...

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) আপন কাজে অচল হলে চলবে। -..............

খ) হল যদি সচল না হয় তাহলে জলদ জল বিফল হবে। -..............

গ) এই কবিতার কবি অতুলপ্রসাদ সেন। -..............

ঘ) আপন কাজে অচল হলে উষর ভূমে সোনার ফসল ফলবে। -..............

৩) **সঠিক শব্দের জোড়া মেলাও।**

'অ' স্তম্ভ	'ব' স্তম্ভ
ক) বিফল হবে	১) পালটি তুলি
খ) উষর ভূমে	২) অচল হলে চলবে না
গ) আপন কাজে	৩) জলদ জল
ঘ) ভেসে যা তুই	৪) সোনার ফসল

৪) **কবিতা থেকে খুঁজে নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।**

ক) ফল ×....................... খ) পরে ×.......................

গ) চল ×....................... ঘ) মুক্ত ×.......................

৫) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো।**

ক) ফসল -....................... খ) নোঙর -.......................

গ) পাল -....................... ঘ) দিক -.......................

৬) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) আপন কাজে কী হলে চলবে না?

খ) অলস স্তুতিগানে কী টলবে না?

গ) কবি কীসের বাঁধন খুলে দিতে বলেছেন?

ঘ) উষর ভূমে কোন ফসল না ফলার কথা বলা হয়েছে?

৭) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) কবি এই কবিতায় কর্মকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

খ) কী করলে বিধি আমাদের সঙ্গে ছলনা করবে না?

৮) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"চলার এক নাম জীবন" - এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

২০. জল আছে তো ভবিষ্যৎ আছে

- সঞ্জয় ভরদ্বাজ

লেখক পরিচিতি

সঞ্জয় ভরদ্বাজ ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আচার্য কাশীলাল মিশ্র এবং মাতা শ্রীমতী মঙ্গলা মিশ্র। প্রমুখ পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা, ছোটগল্প, সমীক্ষা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং দূরদর্শন ও রেডিওতেও প্রসারণ হয়। দৈনিক এবং সাপ্তাহিকের ব্লগ লেখক। রাষ্ট্রপতির দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠিত পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন।

'এক ভিখারিনীর মৃত্যু (নাটক)', 'আমি এমনি কবিতা লিখিনা', চেহারা, 'সে' চুপ্পিয়া (কবিতা সংগ্রহ) তার প্রমুখ রচনা।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠটি একটি পথনাটিকারূপে রচিত হয়েছে। জলের গুরুত্ব এখানে বর্ণিত হয়েছে। জল, প্রাকৃতিক উৎস, একে তৈরী করা যায় না। জলই জীবন, জলছাড়া প্রাণী-উদ্ভিদ কেউই বাঁচতে পারেনা। ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত জলের মাত্র এক শতাংশ পানীয় জল। এই জলের উপর মানুষ ছাড়াও পশুপাখি, বনস্পতি, সেচব্যবস্থা ও আধুনিক শিল্প নির্ভর করে। বৃষ্টি-পাতের মাধ্যমে জল পুনর্ভরণ হয়। বৃষ্টিপাতের বেশীর ভাগ জল নদী, নালার মাধ্যমে সমুদ্রে চলে যায়। ভালো বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড় ও জঙ্গলের প্রয়োজন। মানব সভ্যতার বিকাশের ফলে বন বিনষ্ট হচ্ছে। আজ জল সংরক্ষণ করার জন্য জলের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং বৃক্ষরোপণ প্রচেষ্টা কার্যকরভাবে চালাতে হবে। জলদূষণ যেন না হয় তার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

(প্রায় ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর দল, দলের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবে। এদের ছাত্র-ছাত্রী ক্রমাঙ্ক - ১ম,২য়, এইরূপ ক্রমানুসারে সম্বোধন করা হয়েছে।)

(রাস্তার এক দিক থেকে সমবেত গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে আসছে।)

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।

(দুই অথবা তিনজন গাইছে সম্ভব হলে দু একজন বাজাচ্ছে, বাকি সব বৃষ্টিতে ভেজার অভিনয় করছে।)

(প্রত্যেক দলের একজন করে সামনে আসছে, জোরে ঘোরার অভিনয় করছে, গান, বাজনা এবং নৃত্য করছে সকলে নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক পাত্র আলাদা আলাদা ভূমিকায় অভিনয় শুরু করবে।)

১ম - (সংবাদ পত্র বিক্রেতা) - আজকের টাটকা খবর, শহরে জলের বোতল চুরি বেড়ে গেছে। জলের চুরি বাড়ছে।

২য় - (ভোর সংবাদ) - ভোর সংবাদ - এখন ঘরেও জলের বোতল সুরক্ষিত নয়। ঘরে জলও সুরক্ষিত নয়।

৩য় - (সংবাদ পাঠক) এখন শহরে প্রধান ঘটনা বলা হচ্ছে। শহরের পশ্চিম ভাগে কাল গভীর রাতে জলের ১৭টি বোতল চুরি হয়ে গেছে।

৪র্থ - (ক্রনিকল নিউজ) বড়ো খবর। শহরে পানীয় জল নিয়ে দু দলে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়েছে।

৫ম - (প্রথম জনসাধারণ) শুনছো, সংবাদ পত্রে লেখা আছে যে কাল পাশের কলোনীতে প্রয়োজনের থেকে বেশী জল সংগ্রহের আরোপে জল ইনেসপেক্টার ৪ জনের ঘরে জরিমানা ধার্য করেছেন।

৬ষ্ঠ - (১ম বৃদ্ধ) কি যুগ এলো ! আমাদের সময় পেটের ক্ষিদেয় মরতো কিন্তু এখন পিপাসায় লোক মরছে।

৭ম - (২য় বৃদ্ধ) ভাত না হলেও জল খেয়ে সময় কাটাতো এখন তো জলও পাওয়া যাবেনা।

৮ম - (ইন্টারনেট সমাচার) - কাল এলাকায় জল চুরি করার সময় এক টেম্পোকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

৯ম - (২য় জনসাধারণ) তুমি কে ? আমাদের সবাইকে কী দেখাচ্ছ?

১০ম - (সময়) আমি সময় ৫০ বছর পরের ছবি দেখাচ্ছি। (ছবির শেষে জলের ভবিষ্যতের চিত্র দেখানো হচ্ছে)

১ম - শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ?

১০ম - হ্যাঁ, যখন জলই থাকবে না তখন ভবিষ্যতে কীভাবে বাঁচবে?

২য় - তবে এ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই ? এর কোন সমাধান নেই কি?

১০ম - ঠিক উত্তর পেতে হলে আগে প্রশ্নকে বুঝতে হবে। মানে এই যে প্রথমে এই সমস্যা কী ভাবে উৎপন্ন হল তা বোঝাতে হবে।

৪র্থ - সময়, তুমি বলতে পারবে কি ? এই সমস্যা কিভাবে তৈরী হলো?

১০ম - আমাদের পূর্বপুরুষ বলেছেন যে এক সময় চারিদিকে সবুজ ছিল। পৃথিবী মেঘে ঢাকা ছিল। পাহাড় থেকে জলের ধারা বয়ে যেত। ঝর্ণার জল প্রবাহ বয়ে যেত। নদীগুলি উপচে পড়তো। ছোট বড়ো জলাশয়গগুলিতে জল ভরে রাখার জন্য পৃথিবীর বারোমাস কাজ চলতো।

(বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা এই বাক্যগুলির মুক অভিনয়ের দ্বারা দেখাবে)

৫ম - তারপর কি হলো?

১০ম - এটাই হল মানুষের আদিম রূপের অন্তিম শতাব্দী। মানুষ এখন এক জায়গায় বাস করতে লাগলো এবং তাদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকলো।

৬ষ্ঠ - তাদের মনে হলো পরিবার প্রতিপালনের জন্য চাষবাস করা উচিৎ।

১ম - চাষবাসের জন্য জলের প্রয়োজন। তারা নদী খুঁজতে লাগলো।

৯ম - নদীর আশেপাশে জায়গা খুঁজে পেলো। কুড়ুল, কোদাল, লাঙ্গল চালিয়ে মাটি সমান করে চাষবাস শুরু করলো।

সমবেত- ওঠাও কোদাল... চালাও হল, মাটি করো সমান... বোনো বীজ... শুরু করো চাষ।

(কিছু ছাত্র-ছাত্রী এই বাক্যগুলি মূক অভিনয় দ্বারা অভিনয় করে দেখাবে।)

১০ম - কিন্তু সবাই এত ভাগ্যবান নই। কেউ কেউ চাষ করত, যার আশে পাশে নদী ছিলনা।

১ম - মানুষ বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা বৃষ্টির জল মাটিতে ধরে রাখলো।

২য় - ধরণীতে জল পাওয়ার জন্য কুয়া খুঁড়লো।

৩য় - তারপর কি হলো?

৪র্থ - কুয়া থেকে ভূগর্ভের জল উত্তোলন করে ফসলে সেচের ব্যবস্থা করলো। খেত হরিৎবর্ণের হয়ে গেলো।

৬ষ্ঠ - এখন গ্রামে বসতির বিস্তার হতে লাগলো।

৭ম - জলের প্রয়োজন বাড়তে লাগলো।

৮ম - তারপর হলো বিদ্যুতের আবিষ্কার।

৯ম - বিদ্যুৎ মানুষের জীবনধারাকে বদলে দিল।

১ম - বিদ্যুতের সাহায্যে মোটর দিয়ে ভূগর্ভের জল তুলতে লাগলো।

২য় - জল দ্বারা বিদ্যুৎ তৈরী হয়। বিদ্যুৎ মোটর চালায়।

৬ষ্ঠ - হাজার লিটার জল ভূগর্ভ থেকে বাইরে আনা হয়।

৮ম - মানুষ জল উঠাতে লাগলো। জল ফেলতে লাগলো।

১০ম - জল বিক্রী করতে লাগলো।

সমবেত - মানুষ জল ওঠালো, ফেলতে লাগলো, জল বিক্রী করতে লাগলো।

১ম - মানুষের লোভ বাড়তে লাগলো।

৮ম - আগে পতিত জমি ছিল। অর্দ্ধেক চাষ হতো অর্দ্ধেক পড়ে থাকতো।

১০ম - এখন পুরোটাই চাষ হচ্ছে।

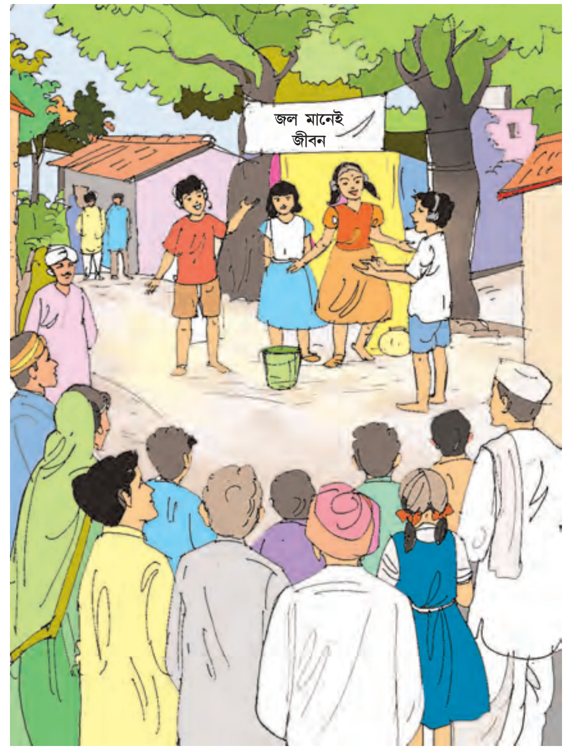

২য় - আগে সার হিসাবে গোবর ও শুকনো পাতার ব্যবহার করা হতো।

৫ম - এখন রাসয়নিক সার ব্যবহার করা হয়।

৬ষ্ঠ - এই বিষ মাটিতে মেশার ফলে ভিতরের পোকা মাকড় মরে গেলো।

১ম - এই রাসায়নিক বিষের ফলে কৃষকবন্ধু– কেঁচো, ছত্রাক মরতে থাকলো।

৮ম - ঘাতক রসায়ন ভূপৃষ্ঠের জলে মিশতে থাকলো।

৯ম - জল দূষিত হতে থাকলো। তবুও মানুষের চেতনা জাগল না।

১ম - আগে কুটির শিল্প ছিল।

২য় - শিল্প পরিবেশের অনুকূল ছিল।

৩য় - মেশিনের অংশ হাতে তৈরী হতো।

৫ম - এখন মেশিন দ্বারা তা তৈরী হয়।

৭ম - মেশিনের বর্জ্য পদার্থ বিনা প্রক্রিয়ায় নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১০ম - মাছ এবং জলচর প্রাণী মরতে থাকে।

২য় - দূষিত জলের জন্য মানুষ অসুস্থ হতে থাকলো।

৩য় - শরীরের অসুখ তাড়াতাড়ি ঠিক হয় কিন্তু মনের অসুখ তাড়াতাড়ি ঠিক হয় না।

৪র্থ - লোভী ও অসাবধানী মানুষ জলের গুরত্ব বুঝতে পারে না।

৫ম - জল প্রাকৃতিক উৎস, একে তৈরী করা যায় না।

৬ষ্ঠ - জলকে পুনর্ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হয়।

৭ম - জলের উৎসের পুনর্ভরণ করা হয়।
৮ম - পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ জল দিয়ে ঘেরা।
৯ম - প্রাপ্ত জলের মাত্র এক শতাংশ পানীয় জল।
১০ম - এই এক শতাংশ জলের উপর মানুষ ছাড়াও বনস্পতি, পশু, সেচব্যবস্থা ও শিল্প নির্ভরশীল।
২য় - জলের সঠিক সংরক্ষণ আমরা করতে পারি না।
৪র্থ - বৃষ্টিপাতের বেশীর ভাগ জল নদী, নালার মাধ্যমে সমুদ্রে চলে যায়।
৫ম - ভালো বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড় ও জঙ্গলের প্রয়োজন ।
৬ষ্ঠ - মানুষ জঙ্গল কেটে ফেলছে।
৭ম - মেঘকে আটকানো যাচ্ছে না। মানুষ পাহাড়কেও সমতল করে ফেলল।
৯ম - মেঘের বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেছে।
২য় - মানুষের অবহেলা বেড়ে চলল। বৃষ্টিপাত কমতে লাগলো।
সমবেত - মানুষ জঙ্গল কাটতে থাকল, বৃষ্টিপাত কম হতে থাকল। মানুষের অবহেলা বাড়তে থাকল। (কিছু কুশীলব দ্বারা মুক অভিনয় করবে।)
৪র্থ - ঘরে ঘরে পাইপ লাইনের দ্বারা জল আসছে।
৬ষ্ঠ - জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বেড়ে যাচ্ছে।
৭ম - ভূগর্ভের জলের স্তর কম হয়ে যাচ্ছে।
৮ম - কখনো চক্র তৈরী করেছো ?
৯ম - এক বিন্দু জল না হলে চক্র ভেঙে যাবে।
১০ম - মানুষ জায়গায় জায়গায় জলচক্র নষ্ট করে দিয়েছে।
সমবেত - এক বিন্দু না হলে চক্র খণ্ডিত হয়ে যাবে মানুষ জায়গায় জায়গায় জলচক্র নষ্ট করে দিয়েছে। (উপরোক্ত বাক্যগুলি কয়েক জন মূক অভিনয় করে দেখাবে।)
সমবেত - (জল কমছে, সংকট আজ, সংকট আগামী কাল। জল কমছে, সংকট আজ সংকট আগামী কাল।)
৩য় - কেউ অঙ্কুর থেকে চারাগাছ জন্মাতে দেখেছো?
৪র্থ - কেউ চারাগাছ থেকে গাছ বাড়তে দেখেছো?
৫ম - চারাগাছের বড়ো বৃক্ষ হতে ১৫ থেকে ২০ বছর লেগে যায়।
৭ম - কি বলতে চাও?
১০ম - ধ্বংস সহজ, নির্মাণ কঠিন।

৮ম - আমরা কি করবো? আমাদের রাস্তা দেখাও সমবেত (আমরা কি করবো... আমাদের রাস্তা দেখাও)

১ম - শুরু করতে হবে আজ থেকে এখনই।

২য় - চারাগাছ তৈরী করো। বৃক্ষ বাড়াও। জঙ্গল কেটো না।

৫ম - পাহাড় বিনষ্ট করো না।

৬ষ্ঠ - এক বিন্দু জলও অপচয় কোরো না।

৭ম - নদীগুলি আবার সংস্কার করো।

৮ম - নদীতে ময়লা আবর্জনা ফেলো না। শিল্পের বর্জ্য পদার্থ ফেলো না।

১০ম - জমির জল জমিতে রাখো। গ্রামের জল গ্রামেই রাখো।

২য় - ছোট ছোট জলাশয় তৈরী করো।

৩য় - প্রথাগত জলাস্রোত পুনরুদ্ধার করো।

৫ম - জমিতে জৈবিক সার ব্যবহার করো।

৬ষ্ঠ - সবাই মিলেমিশে থাকো।

৭ম - শ্রমদানের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি হয়।

৮ম - আমরা প্রতিজ্ঞা করছি।

(সকলে প্রতিজ্ঞা নেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।)

সমবেত - চারাগাছ লাগাবো। বৃক্ষ বাড়াবো। জঙ্গল কাটতে দেবো না। পাহাড় ধ্বংস হতে দেবো না। জৈবিক চাষ করবো। নদী স্বচ্ছ রাখবো। জল সংরক্ষণ করবো। জল সঞ্চয় করবো। ভূপৃষ্ঠের জলের স্তর বাড়াবো। জলের প্রতিটা ফোঁটা বাঁচাবো।

(প্রথমে যে চক্র ঘুরিয়ে ছিল ওই কুশীলব এখন উল্টোদিক থেকে চক্র ঘোরাবে।)

৯ম - আমরা যদি আমাদের প্রতিজ্ঞা পুরো করে থাকি তবে আবার ঐ সময় ফিরে আসবে...

১ম - তখন চারদিকে সবুজ হবে। পৃথিবী মেঘে ঢেকে যাবে। ঝর্নার জলপ্রবাহ বয়ে যাবে। নদী উত্তাল হয়ে উঠবে। ছোট বড়ো প্রাকৃতিক জলাশয় ভরে যাবে।

২য় - ঐ সময়ে আমরা গাইব, বাজাব, নাচব। হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে...।

(সকলে মিলে বৃষ্টিতে ভেজার অভিনয় করছে।)

- অনুবাদিত

২১. একুশের তাৎপর্য

- আবুল ফজল

লেখক পরিচিতি

আবুল ফজল বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম ১লা জুলাই ১৯০৩, মাতকানিয়া উপজেলা, বাংলাদেশ। তাঁর পিতার নাম ফজলুর রহমান, মাতা গুলশন আরা তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি মূলতঃ একজন চিন্তাশীল ও সমাজ মনস্ক প্রবন্ধকার, তাঁর প্রবন্ধে সমাজ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ৪ ই মে ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

পাঠ প্রসঙ্গ

একুশের চেতনায় কেবল যে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, বাঙালীর জাতীয় চেতনাকেও তুলে ধরেছেন। এখানে একুশের তাৎপর্য বহুমুখী। একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাভাষী জনগণের স্মরণীয় গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এই দিনের পরিপেক্ষিতে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালন করা হয়।

ভাষা কী ও কেন, ভাষা দিয়ে কী হয় ব্যক্তি আর জাতির? ভাষা না হলে আর না থাকলে কী চলে না? এসব প্রশ্নের উত্তরেই নিহিত রয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য। ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে- ভাষা ছাড়া মানুষ ভাবতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না, পারে না চিন্তা করতে পর্যন্ত। মানুষ একই সঙ্গে প্রকাশ আর বিকাশধর্মী জীব। ভাষা ছাড়া মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম, মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশও ভাষাকে অবলম্বন করেই ঘটে। তাই ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে উঠতেই চাই ভাষা। ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিজীবনের বিকাশও ঘটে ভাষার সাহায্যেই।

ভাষা ছাড়া জাতিও জাতি হয়ে উঠতে পারে না - বিশেষ একটা ভাষাকে কেন্দ্র করেই জাতীয় সত্তা রূপ পায় ও গড়ে ওঠে। এ বিশেষ ভাষা যে মাতৃভাষা তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই ব্যক্তি-জীবন ও জাতীয় জীবন উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্য অপরিহার্য। জাতির সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি সব কিছুরই প্রাণ হচ্ছে তার মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার

সাহিত্য। তাই মাতৃভাষার ইজ্জত আর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো আপস চলে না। প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে হলেও মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মাতৃভাষার দাবি স্বভাবের দাবি, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার দাবি। এ দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা প্রাণ দিয়েছিলেন- প্রাণ দিয়ে তাঁরা শুধু আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেই বাঁচাননি, আমাদেরও বাঁচার পথ করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা ও তাদের স্মৃতি চিরস্মরণীয়। ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা আমাদের অনন্য গৌরব ও আমাদের গর্ব।

একুশে ফেব্রুয়ারির অশ্রুসিক্ত ইতিহাস প্রতি বছর ফিরে এসে আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারিকে সার্থক করতে হলে একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে বছরের শুধু দিন নয়, সারা বছর ধরেই।

ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহিদ দিবস : ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা পাবার পর তৎকালীন ভারতবর্ষকে দুটি দেশে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান দেশটাকে গড়া হয় ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের অংশ নিয়ে। যাদের মধ্যে ভৌগোলিক কিংবা ভাষা-সংস্কৃতিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই দেশের মূল শাসনের ভার পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর। ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে চালানোর চেষ্টা চলে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতায় উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫২-র ২১ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকারের পুলিশ

গুলি চালায়। মারা যান আব্দুল সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, সফিউর রহমান, আবদুল বরকত এবং আব্দুল জব্বার। এঁরাই প্রথম ভাষা শহিদ। এঁদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে গণআন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং ১৯৭১ - এ স্বাধীন জনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন সমাপ্ত হয়।

১৯৯৯-এর ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' এবং 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' মর্যাদা দেয়।

শব্দার্থ

তাৎপর্য = উদ্দেশ্য
প্রতিষ্ঠা = প্রতিপত্তি
অক্ষম = ক্ষমতাহীন
স্মৃতি = স্মরণ
সর্বাঙ্গীন = সম্পূর্ণ
দৃষ্টান্ত = নিদর্শন
আন্দোলন = সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শন
বিনিময়ে = পরিবর্তে
চিরস্মরণীয় = চিরদিন মনে রাখা
স্মরণ = মনে করা
অপরিহার্য = যা বাদ দেওয়া যায় না
শহিদ = যে দেশের জন্য প্রাণ দেয়।

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। -..............
খ) ভাষা মানুষকে মানুষ করে তোলে না। -..............
গ) মাতৃভাষা আমাদের বাঁচার পথ করে দিয়েছে। -..............
ঘ) ১৯৪৭এ স্বাধীনতা পাওয়ার পর তৎকালীন ভারতবর্ষকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। -..............

৩) কারণ লেখো।

ক) ভাষা ছাড়া জাতিও জাতি হয়ে উঠতে পারেনা...
খ) একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা আমাদের অনন্য গৌরব ও আমাদের গর্ব...
গ) পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালানোর চেষ্টা করা হয়...

৪) **পাঠ থেকে খুঁজে নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।**

ক) প্রশ্ন ×.................... খ) সক্ষম ×......................

গ) বেইজ্জত ×.................... ঘ) অমর্যাদা ×......................

৫) **শব্দার্থগুলি পাঠ থেকে বেছে লেখো।**

ক) নিদর্শন -.................... খ) উদ্দেশ্য -......................

গ) প্রতিপত্তি -.................... ঘ) পরিবর্তন -......................

৬) **পদ পরিবর্তন করো।**

ক) জীব -.................... খ) গর্ব -....................

গ) ভৌগোলিক-.................... ঘ) ব্যক্তি -....................

৭) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) ভাষা না থাকলে কী চলেনা? খ) ভাষা মানুষকে কী করে?

গ) শান্তিপূর্ণ মিছিলে কারা মারা যান ? ঘ)ভাষা আন্দোলন কবে শেষ হয়েছিল?

৮) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) মাতৃভাষার দাবি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?

খ) ভাষা আন্দোলনের সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৯) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :**

"মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা শুধু দায়বদ্ধতার প্রকাশ নয়, এর প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজন" — এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

> **● সর্বদা মনে রেখো। ●**
> 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান।'

● **আমি বুঝেছি :**..

....

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

ক) সংস্কৃতি খ) চিরস্মরণীয় গ) কালপোযোগী ঘ) স্বভাব ঙ) মাতৃভাষা

খ) বাগধারার সাহায্যে বাক্য রচনা করো।

ক) অমাবস্যার চাঁদ খ) আকাশ কুসুম গ) ইঁচড়ে পাকা ঘ) উত্তম মধ্যম

● **উপযোজিত লেখন :**

তোমার বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কীভাবে পালিত হয়ে থাকে, তা জানিয়ে প্রিয় বন্ধুকে পত্র লেখো।

২২. আত্মজীবনী

- এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

লেখক পরিচিতি

১৫ই অক্টোবর ১৯৩৯ সালে তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম শহরে লেখক এ.পি.জে.আবদুল কালামের জন্ম। তাঁর পুরো নাম আবুল পাকির জইনুল-আবেদিন আবদুল কালাম। পিতা জইনুল আবেদিন ও মাতা আশীম্মার প্রিয় সন্তানের শৈশব কাল অতি দারিদ্রতায় অতিবাহিত হয়। অস্বাভাবিক মেধা শক্তির কারণেই এই দরিদ্র বালক ১৯৫৪ সালে সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং ১৯৬০ সালে মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

ডি.আর.ডি.ও.তে তিনি বিজ্ঞানী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু ইসরোতে যোগ দেওয়ার পরে তাঁর আসল পরিচয় ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে ভারত নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। তাই তাঁকে 'ভারতের মিসাইল ম্যান' বলা হয়। ২০০২ সালে তিনি ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হন। তার পূর্বেই ১৯৯৭ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'ভারত রত্ন' পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছিলেন। ২৭ শে জুলাই ২০১৫ সালে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠে-লেখক তাঁর ছেলেবেলার কথা বলেছেন। মাতা-পিতার আদর্শে মানুষ ভারত রত্ন আবদুল কালাম বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে শ্রীমান শিবসুব্রহ্মণ্য আয়রকে পেয়েছিলেন যে তাঁকে ধর্ম ভেদাভেদের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গান্ধীজীর ঘোষণা 'স্বতন্ত্র ভারতীয়রা নিজের ভারত নিজেরা গড়বে'– যা তাঁকে বিজ্ঞানী হতে প্রেরিত করে।

আমার জন্ম মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বীপ শহর রামেশ্বরমের এক মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে। আমার পিতা জইনুল আবেদিনের না ছিল বিশেষ প্রথাগত শিক্ষা, না বিশেষ ধনসম্পদও। কিন্তু এ-সবের অভাব থাকলেও তাঁর ছিল সহজাত প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের প্রকৃত মহানুভবতা। আমার মা আশিয়াম্মার মধ্যে পেয়েছিলাম এক আদর্শ সহায়িকা। ঠিক কতজনকে আমার মা প্রত্যহ অন্ন যোগাতেন আমার মনে নেই, তবে আমরা পরিবারের সকলে মিলে যত জন ছিলাম, বাইরের লোক যারা আমাদের সঙ্গে আহার করত তাদের সংখ্যা যে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বহু লোকের চোখে আমার বাবা-মা ছিলেন এক আদর্শ দম্পতি। আমার মায়ের বংশমর্যাদা অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মনে করা হত। তাঁর এক পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশরা 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

আমি ছিলাম অনেক সন্তানের একজন, মাথায় ছোট, সাধারণ চেহারা। আমার বাবা-মা ছিলেন দীর্ঘকায়, সুদর্শন। আমরা থাকতাম আমাদের পৈতৃক বাড়িতে ১৯শ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। বেশ বড়সড় পাকা বাড়িটি ছিল ইট ও চুনা পাথরে গাঁথা, রামেশ্বরমের মস্কস্ট্রিটে।

আমার বাবা কঠোর সংযম পালন করতেন, সমস্ত রকম বিলাসব্যসন পরিহার করতেন। তবে খাদ্য, ওষুধ, পোশাক ইত্যাদি যা প্রয়োজন সে-সবেরই ব্যবস্থা ছিল। আসলে আমার শৈশবে নিরাপত্তা বোধের কোনও অভাব ছিল না, বাহ্যিক উপকরণে কিংবা মানসিক দিক থেকে।

সাধারণত আমি মায়ের সঙ্গে খেতাম, রান্নাঘরের মেঝেতে বসে আমার সামনে মা একটি কলাপাতা বিছিয়ে দিয়ে তাতে ভাত এবং সুগন্ধী সম্বর ঢেলে দিতেন, আর দিতেন ঘরে তৈরি এক ধরনের ঝাল আচার এবং খানিকটা নারকোলের চাটনি।

যে বিখ্যাত শিবমন্দিরের কল্যাণে তীর্থ যাত্রীদের কাছে রামেশ্বরমের এত মাহাত্ম্য সেটি আমাদের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে দশ মিনিটের পথ। আমাদের পাড়া ছিল প্রধানত মুসলিম-অধ্যুষিত, বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবারও সেখানে থাকত, এবং মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাবই ছিল তাদের।

রামেশ্বরম মন্দিরের বড় পুরোহিত পক্ষীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু

ছিলেন। এই দুজন মানুষ - দুজনেরই বেশবাস প্রথা অনুযায়ী, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনায় রত। প্রশ্ন করবার মতো বয়স হলে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, নামাজ পড়ে কী হয় ? বাবা বলতেন নামাজের মধ্যে রহস্য কিছু নেই। নামাজ বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগ সাধন করে। তিনি বলতেন, "নামাজের সময়ে নিজের শরীরকে অতিক্রম করে মানুষ বিশ্বজগতের সঙ্গে এক হয়ে যায়, যেখানে ধনী - দরিদ্রের, বয়সের, জাতির, ধর্মের কোনও ভেদ নেই।"

সাধারণ ভাবে রামেশ্বরমের ওই ছোট্ট সমাজে উচ্চনীচ ভেদ ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব কঠোর ভাবে রক্ষা করা হত। অবশ্য আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ার, যদিও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন খুবই রক্ষণশীল, তবুও তিনি নিজে খানিকটা বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ছিলেন। সামাজিক বিভেদ তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন ভেঙে দিতে যাতে বিভিন্ন অবস্থার মানুষ সহজেই মেলা মেশা করতে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি আমার সঙ্গে কাটাতেন, বলতেন, "কালাম, আমি চাই তুমি এমন ভাবে বেড়ে ওঠ, যাতে বড় বড় শহরের উচ্চ-শিক্ষিত লোকেদের তুমি সমকক্ষ হতে পার।"

একদিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের শুদ্ধ আচার সম্মত রান্নাঘরে এক মুসলিম ছেলেকে খেতে নিমন্ত্রণ করা, তাঁর স্ত্রী তো ভয়ে আঁতকে উঠলেন। তিনি রান্না ঘরে আমাকে খেতে দিতে রাজি হলেন না। শিবসুব্রহ্মণ্য এতে বিচলিত হলেন না, স্ত্রীর উপর রাগও করলেন না। তার বদলে তিনি নিজের হাতে আমাকে খাবার পরিবেশন করে আমার পাশেই খেতে বসলেন। তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরের দরজার পিছন থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। আমি মনে ভাবছিলাম, আমি যেভাবে ভাত খাচ্ছি, জল খাচ্ছি, খাওয়ার পর ঘরের মেঝে যেভাবে পরিষ্কার করছি, সে-সব কি আমি তাঁদের মতো না করে অন্য রকম ভাবে করলাম বলে তাঁর মনে হল?

যখন চলে আসছিলাম, শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ার আবার পরের সপ্তাহে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করলেন। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি বললেন, আমি যেন ঘাবড়ে না যাই, "রীতি-নীতি যদি বদলাতে চাও, এ-সব সমস্যার মুখোমুখি হতেই হবে।" পরের সপ্তাহে যখন তাদের বাড়ি গেলাম, শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ারের স্ত্রী আমাকে রান্না

ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

এর পর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অবসান হল এবং ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন।... গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, "ভারতীয়রা নিজের ভারত নিজেরা গড়বে।" সারাভারতে অভূতপূর্ব আশার মনোভাব। আমি বাবার কাছে রামেশ্বরম ছেড়ে জেলা সদর রামনাথপুরমে গিয়ে পড়া শোনা করবার অনুমতি চাহিলাম।... আমার মা-র মনে দ্বিধা ছিল, বাবা তাঁকে খলিল জিব্রান-এর লেখা শোনালেন, "তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়। জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা তার নিজেরই জন্যে, তোমার সন্তানেরা তারই সন্তান। তোমার মধ্যে দিয়ে তারা আসে, তোমার কাছ থেকে নয়। তোমার ভালবাসা তাদেরকে দেবে, তোমার ভাবনা-চিন্তা নয়, কারণ তাদের নিজেদেরই ভাবনা-চিন্তা আছে।"

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ

প্রত্যহ = প্রতিদিন
পরিহার = ত্যাগ
গোষ্ঠী = বংশ
নিরাপত্তা = নিরাপদ অবস্থা
অধ্যুষিত = অধিষ্ঠিত
উপনিবিষ্ট = স্থাপিত
নৈশভোজ = রাতের আহার
প্রজ্ঞা = প্রগাঢ় জ্ঞান, গভীর জ্ঞান

অনুশীলনী

সূচনা অনুসারে কৃতকার্য সম্পাদন করো।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

আবদুল কালামের মা বাবাকে দেখতে যেমন ছিল

খ)

পাঠে উল্লেখিত জায়গার নাম

২) রিক্ত ছকে সঠিক শব্দ লেখো।

ক) এ.পি.জে আবদুল কালামের বাবার নাম - ....

খ) সাধারণত আবদুল কালাম যার সঙ্গে খাবার খেতো - ....

গ) আবদুল কালামের বিজ্ঞান শিক্ষকের নাম - ....

৩) **কারণ লেখো।**

ক) শিবসুব্রহ্মণ্যের স্ত্রী আবদুল কালামকে রান্নাঘরে খেতে দিতে রাজি হন নি।

খ) আবদুল কালামের মায়ের বংশ মর্যাদা অনেক বেশী বলে মনে হ'ত।

৪) **পাঠ থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।**

ক) কম ×...................... খ) দুর্গন্ধী ×......................

গ) খর্বকায় ×...................... ঘ) আন্তরিক ×......................

৫) **এক বাক্যে উত্তর দাও।**

ক) এ.পি.জে আবদুল কালামের জন্ম কোন শহরে হয়েছিল ?

খ) আবদুল কালামকে কে নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন?

গ) আবদুল কালামের মায়ের নাম কী? ঘ) গান্ধীজী কী ঘোষণা করেছিলেন?

৬) **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) ছোট বেলায় আবদুল কালাম কোথায় বসে কেমন খাবার খেতেন?

খ) আবদুল কালামের পিতার মতানুযায়ী নামাজ কেন পড়া হয়?

৭) **ব্যক্তিগত প্রশ্ন :** ''মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা উচিৎ না।''- এ সম্বন্ধে তোমার মতামত লেখো।

> **● সর্বদা মনে রেখো। ●**
> '''জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক মহান।''

● **আমি বুঝেছি :**..

....

● **ভাষাবিন্দু :**

ক) পা হইতে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।

খ) অকালে যা পেকে গেছে = অকালপক্ক।

উপরোক্ত অধোরেখাঙ্কিত শব্দগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে একাধিক শব্দ মিলে এই শব্দগুলি তৈরি হয়েছে। একে 'বাক্য সংকোচন' অথবা 'এক কথায় প্রকাশ' বলা হয়।

কৃতি - তোমার জানা দশটি 'বাক্য সংকোচনের' উদাহরণ লেখো।

● **উপযোজিত লেখন :**

নিম্নলিখিত তথ্যের সাহায্যে একটা কাহিনী রচনা করো এবং তার সঠিক শিরোনাম লেখো।

তথ্য - একটা হুলো বিড়াল... পাড়ায় তার একছত্র রাজত্ব... আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ক্রোধিত হওয়া... আক্রমণ... দাঁত ভাঙা... শিক্ষা।

২৩. ছাত্র আর শিক্ষকের সংলাপ

- সংকলিত

ছাত্র - সততার কথা বলছেন, স্যার ? আজ সমাজে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই অসৎ মানুষের ভিড়। যেখানে প্রতিটি মানুষ অসৎ প্রতিটি মানুষের কাজকর্ম অসাধু, সেখানে কি করে আপনি আশা করেন, ছাত্ররা সৎ হবে- সৎভাবে পরীক্ষা দেবে ?

শিক্ষক - তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি এবিষয়টি নিয়ে কিছু ভেবেছো। কিন্তু তোমার চিন্তাধারাটি অন্ধকার কানা গলির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে- আলোকিত পথের সন্ধান পায়নি। তাই তুমি এ-রকম কথা বলছো। কিন্তু মনে রেখো, স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না।

ছাত্র - স্বামী বিবেকানন্দের কথা ছাড়ুন, স্যার। আজকের দিনে কে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মেনে চলছে? যারা মেনে চলছে বলে দাবি করে, তারা শুধু মানুষকে ঠকাবার জন্যে তা বলে থাকে। দোকানের শো-কেসে স্বামী বিবেকানন্দকে সাজিয়ে রেখে ভেতরে প্রতারণার ঢালাও ব্যবস্থা পাকা। এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ কেন, কোন মহাপুরুষের কথা উচ্চারণ না করাই ভালো।

শিক্ষক - তুমি বর্তমান যুগ নিয়ে বড়ো বেশী হতাশায় ভুগছো। কিন্তু জানো তো, হতাশায় মানুষের ক্ষতি হয়— সমাজের ক্ষতি হয়। কাজেই, আশাবাদী হও। আশা করতে শেখো।

ছাত্র - এ যুগে মানুষের কাছে আমাদের আশা করবার কিছুই নেই।

শিক্ষক - মানুষ আজও ততখানি নিঃস্ব, দেউলে হয়নি। তুমি নিতান্তই অন্ধ হয়ে গেছ। তাই মানুষের মধ্যে আশাব্যঞ্জক কিছু দেখতে পাও না, পরীক্ষার অসদুপায় অবলম্বনের মধ্যে কিছু অন্যায় দেখতে পাওনা।

ছাত্র - আপনি আমাকে যা-ই বলুন, এ-যুগে সততার কোন মূল্য নেই। এ-অবস্থায় সৎভাবে পরীক্ষা দিয়ে কী লাভ?

শিক্ষক - দেখ, সততার মূল্য সব যুগেই ছিল, এখনও আছে। পরীক্ষায় সততার মূল্য আরও বেশী। অধিকাংশ ছাত্রই সৎভাবে পরীক্ষা দেয়।

ছাত্র - না স্যার, পরীক্ষার হলে প্রায় সব ছাত্রই নকল করে। আর, করবে না-ই বা কেন? আগেও তো করত।

শিক্ষক - নকল তা আগেও ছিল, এখনও আছে। তবে আগে ছিল অল্প মাত্রায় এখন তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যারা লেখাপড়া করতে ভালোবাসে না, তারাই অসদুপায় অবলম্বন করে। তাদের লেখাপড়ায় অনিচ্ছার মূলে আছে তাদের চিত্ত-বিক্ষেপ। তাদের মনটা নানা বিষয়ে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে। সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলো, রাজনীতি ইত্যাদি নানা চটকদার এবং চমকদার ব্যাপার তাদের মনের অনেকটাই জবরদখল করে নেয়। লেখাপড়ার জন্যে আর স্থান সংকুলান হয় না।

ছাত্র - তাহলে কি আপনি সমাজ থেকে সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলো, রাজনীতি ইত্যাদি তুলে দিতে বলেন, নাকি ছাত্রদের ওগুলো থেকে সরে থাকতে বলেন।

শিক্ষক - না। ওগুলোও সমাজ থাকবে এবং ছাত্ররাও ওগুলো থেকে দূরে সরে থাকবে না। ছাত্ররা সিনেমা-থিয়েটার দেখবে, খেলাধুলো করবে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করবে, দরকার হলে অংশও গ্রহণ করবে। কিন্তু লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে নয়। সব দিকে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে তাদের। সবার আগে তাদের দায়িত্ব-সচেতন হতে হবে। দায়িত্ব নিজের প্রতি, দায়িত্ব তার পরিবারের প্রতি, দায়িত্ব তার সমাজের প্রতি। সিনেমা, থিয়েটার, রাজনীতি ইত্যাদি তাদের জীবন সত্যের সন্ধান দেবে। খেলাধুলো দেবে প্রতিযোগিতাময় জীবনে জয়লাভের প্রেরণা। তখন তারাই উপলব্ধি করবে, লেখাপড়া হলো জীবনের প্রস্তুতির চাবিকাঠি। তাহলে লেখাপড়ায় অবহেলা নয়, লেখাপড়ায় প্রযত্নই হবে তাদের লক্ষ্য।

ছাত্র - আপনার কথাগুলো বেশ ভালো লাগছে, স্যার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা, আমাদের দেশে তেমন দিন আসবে। ছাত্ররা মন দিয়ে শুধু লেখাপড়াই করবে, পরীক্ষায় নকল করবে না– এসব আকাশ কুসুম কল্পণা। বাস্তবে কোনদিনই তেমন হবে না।

শিক্ষক - আসল কথা কি জানো ? অন্ধকারে থেকে থেকে বা অন্ধকার বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তোমরা শুধু অন্ধকারই দেখ। আলোকিত দিকটা তোমরা কেউ আজকাল দেখতে পাচ্ছ না।

ছাত্র - কি করে দেখব স্যার? চারিদিকে তো অন্ধকার। বিশেষতঃ পরীক্ষার ব্যাপারে।

শিক্ষক - একটা কথা আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। সেটা হচ্ছে, পড়াশোনা করলে পরীক্ষায় ঠিক সফল হওয়া যায়। যদি ছাত্ররা নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাহলে তার সাফল্য কেউ আটকাতে পারবে না। তবে একথা ঠিক, আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন দরকার। পাঠ্য-সূচীরও পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শিক্ষার বৈচিত্রীকরণও চাই। সবাইকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কেতাবী শিক্ষার পাতার পর পাতা মুখস্থ করতে হবে— এই গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনও একান্ত দরকার। নানা কারিগরি-বিদ্যা ও প্রযুক্তি-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষানিকেতন গড়ে তোলা আবশ্যক। তাহলে বহু ছাত্র সেদিকে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে। তাতে তার শক্তি ও প্রতিভার সদ্ব্যবহার হবে। তা নইলে গতানুগতিক শিক্ষাধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলে শক্তি ও প্রতিভার হবে অপচয়। এখন দেশে তাই হচ্ছে। তবে আশার কথা, সরকার ও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন সে বিষয়ে চিন্তা করছেন। .... ভবিষ্যতে হয়তো দেশে কারিগরি-বিদ্যা ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বহু শিক্ষা-নিকেতন গড়ে উঠবে। তখন দেখবে, দেশে পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। আর, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন? তাও দেখবে, কমে যাবে।

ছাত্র - তাহলে তো খুবই ভালো হয় স্যার। আমাদেরও আর ভালো লাগছে না পরীক্ষার অসদুপায় অবলম্বনের এই নিন্দার কথা শুনতে। জানেন স্যার, এখন আমাদের মার্কশীট বা সার্টিফিকেটকে কেউ বিশেষ দাম দেয় না। তখন নিশ্চয়ই দেবে।

শিক্ষক - নিশ্চয়ই। তার চেয়েও বড়ো কথা, জাতি বাঁচবে। জাতির মূল থেকে দুর্নীতি ও অসাধুতার বিষ মুছে যাবে। ছাত্র-সমাজেরও দায়িত্ববোধ বাড়বে। শুধু তাদের কলঙ্কমোচন হবে না, নতুন জন্ম লাভ করে তারা জাতির সেবায় নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। আমি সেই শুভ দিনের অপেক্ষা করে আছি।

ছাত্র - ধন্যবাদ স্যার! আমরাও সেই দিনের অপেক্ষা করে থাকবো।।

২৪. হাইকু

- কমলেশ ভট্ট কমল

কবি পরিচিতি

কমলেশ ভট্ট কমলের জন্ম ১৩ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের জফরপুরে। তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারে রাজপত্রিত অধিকারী (গেজেটেড অধিকারী) ছিলেন। কিন্তু রাজকীয় সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর লেখন কার্যও করতেন। কাহিনী, গজল, হাইকু, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ২১টি বই প্রকাশিত হয়েছে। অমলতাস, নঙ্গিলস্থান, সহ্যাদ্রি কা সঙ্গীত, শিখরো কে সোপান, দো সৌ সাল কা আদমী, মর্তেকা কী মীনার ইত্যাদী তাঁর প্রধান রচনা।

কবিতা প্রসঙ্গ

হাইকু এক ধরণের লোকপ্রিয় জাপানি কবিতা। হাইকুকে বিশ্বের সবথেকে ছোট কবিতা বলা হয়। বাংলা ভাষায় ১৭ অক্ষরে হাইকু লেখা প্রচলিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় হাইকু অনুবাদ ও রচনা করেন। তবে তিনি ৫-৭-৫ এর বাঁধা ধরা নিয়ম অবলম্বন করেন নাই । সাধারণতঃ প্রকৃতির উপরে ভিত্তি করে হাইকু লেখা হয়। কবি এই কবিতায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন অনুভবকে সীমিত শব্দে অর্থপূর্ণ রূপে প্রস্তুত করেছেন।

✻ মানবে কে'বা
সরল হওয়াটা
বড় কঠিন !

✻ প্রেমের চেয়ে
কোন রঙটি শ্রেষ্ঠ
এই ভূতলে!

✻ সমুদ্র নহে
নিজ ছায়া লঙ্ঘিয়া
দেখাও তবে !

✻ আশ্রয় দিল
বনস্পতিদেরও
উঁচু বৃক্ষ যে !

✼ প্রীতি ও প্রীতি
জীবন গঠনের
ঐ এক রীতি!

✼ সংকল্প মম
আমা হতেও বড়
হারিব নাহি!

✼ পৌঁছে দিব ঐ
গগনে কখনও
শব্দের পাখা !

✼ ইহা নিশ্চয়
আঁধারও কাটবে
ভোরও হবে!

✼ এসো হে গ্রীষ্ম
তৈরি আছি মোরাও
বলে কোকিলে!

✼ অঙ্কুর নয়
জীবনই জীবন
বীজের মাঝে !

(- অনুবাদিত)

অনুশীলনী

১) **ভাব সম্প্রাসরণ করো।**

ক) মানবে কে'বা
সরল হওয়াটা
বড় কঠিন!

খ) ইহা নিশ্চয়
আঁধারও কাটবে
ভোরও হবে!

গ) অঙ্কুর নয়
জীবনই জীবন
বীজের মাঝে!

● **উপযোজিত লেখন :**

ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিছু হাইকু সংগ্রহ করে পড়ো।

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठीची पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तके

- मुलांसाठीच्या संस्कार कथा
- बालगीते
- उपयुक्त असा मराठी भाषा शब्दार्थ संग्रह
- सर्वांच्या संग्रही असावी अशी पुस्तके
- स्फूर्तीगीत
- गीतमंजुषा
- निवडक कवी, लेखक यांच्या कथांनी युक्त पुस्तक

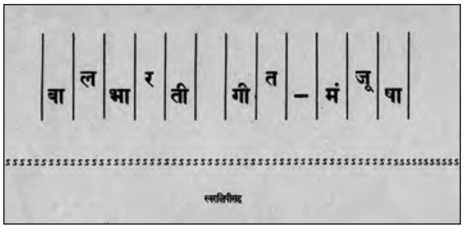

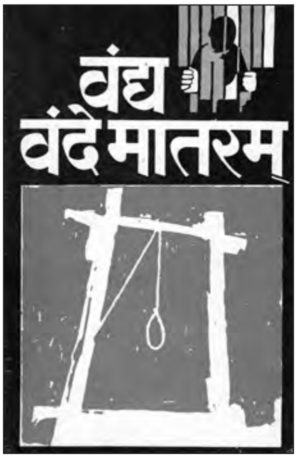

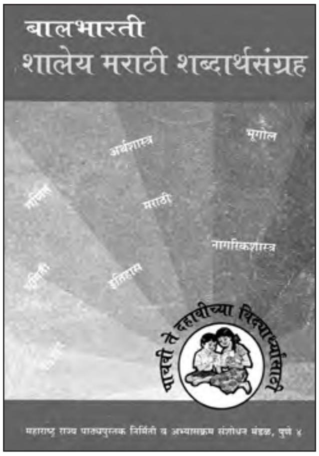

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে।

बालभारती इयत्ता ७ वी (बंगाली माध्यम)

₹ 46.00